সাহসী
মানুষের
গল্প
৩
মোশাররফ হোসেন খান

সাহসী মানুষের গল্প-৩

www.icsbook.info

মোশাররফ হোসেন খান

এই সিরিজের অন্যান্য বই

- সাহসী মানুষের গল্প-১
- সাহসী মানুষের গল্প-২
- সাহসী মানুষের গল্প-৪

www.icsbook.info

সাহসী মানুষের গল্প-৩

মোশাররফ হোসেন খান

আই.সি.এস পাবলিকেশন
ঢাকা

www.icsbook.info

সাহসী মানুষের গল্প-৩

মোশাররফ হোসেন খান

প্রকাশনায়
আই.সি.এস পাবলিকেশন
৪৮/১-এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ : ১৪০১ বাংলা
আগস্ট : ১৯৯৪ ইংরেজি
রবিউল আউয়াল : ১৪১৫ হিজরি
দ্বিতীয় প্রকাশ : প্রথম সংস্করণ
পৌষ : ১৪০৬
ডিসেম্বর : ১৯৯৯
রমযান : ১৪২০
তৃতীয় প্রকাশ : দ্বিতীয় সংস্করণ
বৈশাখ : ১৪১৭
এপ্রিল : ২০১০
রবিউস সানি : ১৪৩১
কম্পোজ
র‍্যাক্স কম্পিউটার, ঢাকা
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
হামিদুল ইসলাম
দাম
৪৫ টাকা

www.icsbook.info

পাথরে পারদ জ্বলে
জলে ভাঙে ঢেউ
ভাঙতে ভাঙতে জানি
গড়ে যাবে কেউ

www.icsbook.info

আই.সি.এস পাবলিকেশনের অন্যান্য বই

১. রক্তাক্ত জনপদ
২. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক
৩. ইসলামী আন্দোলন : সাফল্যের শর্তাবলী
৪. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান
৫. মোদের চলার পথ ইসলাম
৬. আদর্শ কিভাবে প্রচার করতে হবে
৭. মুক্তির পয়গাম
৮. এসো আলোর পথে
৯. আমরা কি চাই? কেন চাই? কিভাবে চাই?
১০. কর্মপদ্ধতি
১১. সংবিধান
১২. সাহসী মানুষের গল্প-১
১৩. সাহসী মানুষের গল্প-২
১৪. সাহসী মানুষের গল্প-৩
১৫. সাহসী মানুষের গল্প-৪
১৬. সিলেবাসভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন
১৭. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার স্মারক-২০০৪
১৮. ক্যারিয়ার বিকশিত জীবনের দ্বার
১৯. কিশোর মনে ভাবনা জাগা
২০. মোরা বড় হতে চাই
২১. অর্থনীতিতে রাসূলের (সা) দশ দফা
২২. ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ
২৩. দিগ দিগন্ত বই
২৪. মানব দেহের অলৌকিক রহস্য

www.icsbook.info

গল্পসূচি

www.icsbook.info

দারুণ খরার কাল! ভয়ানক দুর্ভিক্ষ!

বৃষ্টি নেই সারা বছর। ফসল ফলবে কিভাবে?

অভাব আর অভাব। চারদিকে কেবল অভাবের কাল ছায়া। ছায়াটি ক্রমশ দীর্ঘ হতে হতে এক সময় গ্রাস করে ফেললো পুরো কুরাইশ গোত্রকে।

কে আর সচ্ছল আছে?

বনী হাশিমের মধ্যে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ এবং তার চাচা আব্বাস তবুও কিছুটা ভাল আছেন। অন্যদের তুলনায়।

www.icsbook.info

কিন্তু এই আকাল আর অভাবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্টে পড়ে গেলেন আবু তালিব।

মান-সম্মান আর মর্যাদার দিক থেকে কোনো কমতি নেই আবু তালিবের। কমতি নেই কোনো শরাফতি থেকেও। কিন্তু তাতে কী?

অভাব তাকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেললো যে তিনি বিদিশা হয়ে পড়লেন।

ভাবছেন আবু তালিব।–

একা হলেও কথা ছিল। সংসারে অনেক সন্তান। বিশাল একটি পরিবার।

এতবড় পরিবারটিকে তিনি কিভাবে সামলাবেন? এই চরম দুর্দিন আর অভাবের মধ্যে?

ভেবে কোনো কূল-কিনারা করতে পারছেন না আবু তালিব।

অথই আর উত্তাল সাগরে তিনি যেন এক ভাসমান, কূলহারা নাবিক।

এমন সময়।–

ঠিক এমনি এক দুঃসময়ে নবী মুহাম্মাদের (সা) হৃদয়েও বেদনার ঝড় বয়ে গেল।

তিনিও ভাবছেন।

ভাবছেন কী করা যায় চাচা আবু তালিবের জন্য? তার দুর্দশায় তিনিও অস্থির হয়ে পড়লেন। ভাবতে ভাবতে তিনি ছুটে গেলেন চাচা আব্বাসের কাছে। বললেন :

চাচা! আপনি তো জানেন, আপনার ভাই আবু তালিবের কথা। জানেন তার পরিবারের কথা। কী যে দুঃসহ কষ্টের মধ্যে তাদের দিন কাটছে! এতগুলো সন্তান নিয়ে তিনি কেবলই ক্ষুধার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন। চলুন না আমরা তার কাছে যাই এবং তার কিছু ছেলের দায়িত্ব আমাদের কাঁধে তুলে নিয়ে তাকে কিছুটা হালকা করে তুলি! তার একটি ছেলেকে আমি নেব, আর একটি ছেলেকে আপনি নেবেন!

www.icsbook.info

রাসূলের (সা) প্রস্তাব শুনেই হাসিমুখে বললেন আব্বাস ঃ সত্যিই তুমি আমাকে একটি কল্যাণের দিকে আহ্বান জানিয়েছে। সত্যিই তুমি একটি ভাল কাজের প্রতি আমাকে উৎসাহিত করেছ!

কথা শেষ।

সিদ্ধান্তের পালাও শেষ।

এবার যাবার পালা আবু তালিবের বাড়িতে।

রাসূল (সা) এবং আব্বাস-দু'জন মিলে চলে গেলেন আবু তালিবের কাছে। গিয়ে তাকে বললেন :

আমরা এসেছি। আমরা এসেছি আপনার পরিবারের কিছু বোঝা হালকা করার জন্যে। মানুষ যে দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে– তা থেকে আপনাকে কিছুটা মুক্তি দিতে এসেছি আমরা।

তাদের কথা শুনে আবু তালিব একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন :

আকীলকে আমার জন্য রেখে যা খুশি তোমরা তাই করতে পার। আমার কোনো আপত্তি নেই।

তার কথা শেষ হলে রাসূল (সা) সাথে করে নিলেন আলীকে। আর আব্বাস নিলেন জাফরকে।

দু'জন-দু'জনকে সাথে নিয়ে যার যার বাড়িতে ফিরে গেলেন।

আলী বড় হতে থাকলেন রাসূলের (সা) তত্ত্বাবধানে।

আর জাফর বড় হচ্ছেন, লালিত-পালিত হচ্ছেন আব্বাসের দায়িত্বে।

দুটো ছেলেকে বিদায় দেবার পর পিতা আবু তালিবের চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো

হাজার হোক পিতা তো!

তার এক চোখে সন্তান দিয়ে দেবার লজ্জা এবং বেদনা, আর অন্য চোখে তাদের ক্ষুধা থেকে মুক্তির আনন্দ।

রাসূলের (সা) নবুওয়াত লাভের সাথে সাথেই যুবকদের মধ্যে প্রথম ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করলেন হযরত আলী।

www.icsbook.info

আর জাফর?

চাচা আব্বাসের কাছে, তার আদর-যত্নে আর স্নেহের ছায়ায় ক্রমশ বেড়ে উঠছেন। তিনি যখন যৌবনে পা রাখলেন, তখন– তখনই তিনি গ্রহণ করলেন ইসলাম।

রাসূল (সা) মক্কার 'দারুল আরকাম' থেকে মানুষকে দাওয়াত দিতেন ইসলামের।

দাওয়াত দিতেন আল্লাহর দিকে।

সত্যের দিকে।

আলোর দিকে।

ঝলমলে পথের দিকে।

তাঁর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তখন বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রাসূল (সা) তাদেরকে নিয়ে 'দারুল আরকামে' একদিন নামাযে দাঁড়িয়েছেন।

সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা। গায়ে-গায়ে, সোজা, কাতারবন্দী।

নামায আদায় করছেন রাসূল (সা) তাদেরকে নিয়ে।

কী চমৎকার এক দৃশ্য!

এমন দৃশ্য এর আগে আর কখনও অন্য কেউ দেখেনি। দেখেননি আব্বাসও।

তিনি তো হতবাক!

দাঁড়িয়ে আছেন রাসূল (সা) এবং তাঁর সাথীদের নামায আদায়ের দৃশ্য দেখার জন্য। ভেতরে ভেতরে তিনি পুলকিত এবং শিহরিত হয়ে উঠছেন।

একি! রাসূলের (সা) পাশে আলী?

এই দৃশ্যটিও খুব ভালো লাগলো আব্বাসের।

পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন জাফর। নীরব, নিশ্চুপ। তিনি তখনো শামিল হননি রাসূলের (সা) কাতারে।

www.icsbook.info

আব্বাস আস্তে করে ডাকলেন জাফরকে।

বললেন, জাফর! তুমিও তোমার চাচাতো ভাই মুহাম্মাদের (সা) একপাশে দাঁড়িয়ে যাও না!

আব্বাসের নির্দেশ পেয়েই রাসূলের (সা) কাতারে শামিল হয়ে নামায আদায় করলেন জাফর।

জীবনে তার এই প্রথম নামাযে দাঁড়ানো।

এই প্রথম রুকু এবং সিজদায় যাওয়া।

ঘটনাটি তার মধ্যে দারুণভাবে নাড়া দিল।

এর কিছুদিন পরই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইসলাম গ্রহণ করলেন, কিন্তু একা নন। সাথে তার স্ত্রী আসমাও আছেন।

ইসলাম গ্রহণ মানেই তো এক অন্য জীবন!

ইসলাম গ্রহণ মানেই তো এক আলোকিত পথ।

আলোকিত!–

কিন্তু মসৃণ নয়। কংকর বিছানো, কাঁটা ছড়ানো, পাথরের পর্বত ডিঙানো–কত রকমের বন্ধুর পথ মাড়িয়ে, কতশত অগ্নিপরীক্ষায় পাস করে তবেই না পৌঁছানো যায় এই পথে কাঙ্ক্ষিত মনজিলে!
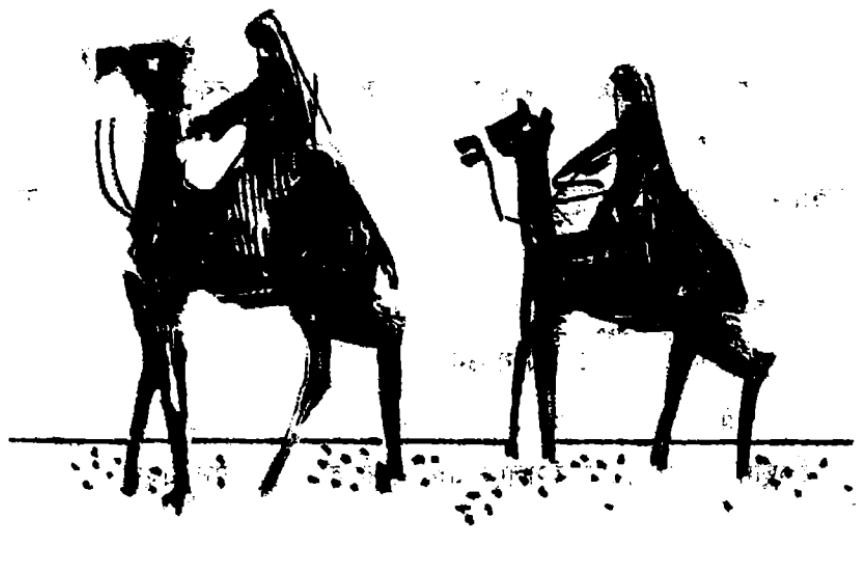
একথা সে সময়ে প্রত্যেক মুসলমানই জানতেন। জানতেন জাফর এবং তার স্ত্রীও।

ইসলাম গ্রহণের ফলে সেই সময়ে অন্য মুসলমানের ওপর যে ধরনের শারীরিক, মানসিক এবং বহুমুখী নির্যাতন নেমে এসেছিল, সেইসব নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হলো তাদেরও।

তখন চলছে কুরাইশদের মধ্যে চিরুনি অভিযান।

কে মুসলমান হলো? খবর নাও। ধর তাকে। মার তাকে। নির্মূল করে ফেল তাকে পৃথিবী থেকে।

– এ ধরনের অত্যাচার নিপীড়নের শিকার হলেন জাফররাও।

www.icsbook.info

এমনি এক দুঃসময়ে তিনি, তার স্ত্রী এবং আরো কিছু সাহাবা চলে গেলেন প্রাণপ্রিয় রাসূলের (সা) কাছে। নবীর কাছে তারা সবাই হিজরাতের অনুমতি চাইলেন।

আবেদন শুনে রাসূল (সা) তাদেরকে হাবশায় হিজরাতের অনুমতি দিলেন।

দিলেন বটে!–

কিন্তু অত্যন্ত ব্যথাভরা হৃদয়ে।

কিসের ব্যথা?

ব্যথা একটিই।–

রাসূলের (সা) হৃদয়কে আকুল করে তুলছে বারবার। ভাবছেন– এই তো, এই সেই মাটি, এই তো সেইসব গৃহ, পথপ্রান্তর, আলো-বাতাস, যেখানে এরা ভূমিষ্ঠ হয়েছে। যেখানে এরা পেরিয়ে এসেছে শৈশব, কৈশোর। আজ, সেই আপনভূমি ছেড়ে এদেরকে পাড়ি দিতে হচ্ছে অজানার পথে! বিদেশ বিভূঁইয়ে!

www.icsbook.info

এরচেয়ে বেদনার আর কী হতে পারে!

কিন্তু এদের অপরাধ?

কোন্ অপরাধে এদের ছাড়তে হচ্ছে প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি?

অপরাধ আর কিছু নয়। সে কেবল ইসলাম গ্রহণ। সত্য গ্রহণ।

একমাত্র ইসলাম গ্রহণের ফলেই এদেরকে ছাড়তে হচ্ছে স্বদেশ।

রাসূলের (সা) জন্যে ছিল এটা একটা আফসোসের বিষয় বটে।

জাফর চলছেন তার সাথীদের নিয়ে।

কাফেলাটি এগিয়ে চলেছে হাবশার দিকে।

নেতৃত্বে আছেন জাফর।

তার নেতৃত্বেই একসময় তারা পৌঁছে গেলেন হাবশায়। আশ্রয় নিলেন সেখানকার সৎ এবং দরদি নাজজাশীর দরবারে।

নাজজাশীর দরবারে আশ্রয় লাভ করে তারা হাঁপ ছাড়লেন। কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন। নাজজাশীর দরবারে কোনো শংকা নেই, কোনো ভয় নেই, নেই কোনো সংকোচ। বরং প্রাণ খুলে তারা এখানে মহান রাব্বুল আলামীনের ইবাদাত করার সুযোগ পেলেন।

মক্কার কুরাইশ কাফেররা তখনো ক্ষিপ্ত। তখনো তারা কূট-কৌশল আর ষড়যন্ত্র থেকে পিছিয়ে নেই।

কী কৌশলে হাবশায় হিজরাতকারী ঐসব মুমিন-মুসলিমকে হত্যা করা যায়? কিংবা ফিরিয়ে আনা যায়? কিভাবে?

অনেক ভাবলো তারা।

যত না ভাবলো, তার চেয়েও বেশি বিস্তার করলো ষড়যন্ত্রের জাল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো ষড়যন্ত্রই তাদের কাজে এলো না।

সবই বিফল হল সত্যের কাছে।

সাহসের কাছে।

মহান রাব্বুল আলামীনের ফয়সালার কাছে।

www.icsbook.info

সত্যিই তো, কাফের মুশরিক কিংবা ইসলামের শত্রুদের কোনো ষড়যন্ত্রই শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারে না।

সফল হয় কেবল আল্লাহর রহমত এবং ফয়সালা।

হাবশায় হলোও তাই।

চক্রান্তকারীরা ব্যর্থ হয়ে সেখান থেকে ফিরে এলো।

জাফর এবং তার স্ত্রী হাবশার নাজজাশীর দরবারে পরম যত্নে, পরম সম্মানের সাথে, নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদে একে একে দশটি বছর পার করে দিলেন।

দশ বছর পর।–

সপ্তম হিজরিতে জাফর তার স্ত্রীসহ আরো কিছু মুসলমান হাবশা থেকে ইয়াসরিবের [মদীনা] দিকে যাত্রা করলেন।

কী বিস্ময়কর ব্যাপার!

তারাও মদীনায় পৌঁছুলেন, আর এদিকে রাসূলও (সা) খাইবার বিজয় শেষ করে মদীনায় ফিরলেন।

জাফরকে দেখে রাসূল (সা) এত খুশি হলেন যে তার দু'চোখের মাঝখানে চুমু দিয়ে দয়ার নবীজী (সা) আবেগভরা কণ্ঠে বললেন :

আমি জানিনে, খাইবার বিজয় আর জাফরের আগমন– দুটির কোন্‌টির কারণে আমি আজ এত বেশি খুশি।

রাসূলের (সা) ভালোবাসা, আদর আর সাগরসমান স্নেহে ধন্য এই জাফরই তো শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছিলেন অসীম সাহসিকতার স্বাক্ষর রেখে।

যুদ্ধে তার দু'টি হাতই কেটে পড়ে গিয়েছিল। তার শাহাদাতের পর হযরত জিব্রাঈল আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলকে (সা) জানান সেই সুসংবাদ।

বলেন–

আল্লাহ তা'য়ালা জাফরকে তার কর্তিত দু'টি হাতের বদলে দান করেছেন নতুন দু'টি রক্তরাঙা হাত। তিনি এখন জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছেন।–

www.icsbook.info

আল্লাহর দেয়া নতুন দু'টি হাত নিয়ে জাফর ফেরেশতাদের সাথে বেহেশতে কবুতরের মত উড়ে বেড়াচ্ছেন!– বিষয়টি হয়তো আমরা আগেও জেনেছি।

কিন্তু আমরা কি জানি, এই জাফরই আবার ব্যক্তিজীবনে কী অসাধারণ এক মানুষ ছিলেন?

আবু হুরাইরার (রা) বর্ণনায় আমরা তার যে সামান্য ইঙ্গিত মাত্র পাচ্ছি– তাওতো বিরল এক দৃষ্টান্ত। তিনি বলছেন :

'আমাদের মিসকিন সম্প্রদায়ের প্রতি জাফর ছিলেন অত্যন্ত সদয় এবং দয়ালু। আমাদের সংগে নিয়ে তিনি বাড়িতে যেতেন। তার বাড়িতে যে খাবার থাকতো তা আমাদেরকে খাওয়াতেন। যখন খাবার শেষ হয়ে যেত তখন তার ঘি-এর মশকটি বের করে আমাদেরকে দিতেন। মশকটির ঘি শেষ হলে সেটা ফেঁড়ে তার ভেতরের গায়ে যেটুকু লেগে থাকতো, তাও আমরা চেটে-পুটে শেষ করে ফেলতাম।'

এমনই ছিল জাফরের উদার হৃদয়!

আর মানুষ হিসেবে?

রাসূল (সা) নিজেই বলতেন :

www.icsbook.info

'আমার আগে যত নবী এসেছেন তাঁদের মাত্র সাতজন বন্ধু দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আমার বিশেষ বন্ধুর সংখ্যা চৌদ্দ এবং জাফর তার একজন।'

কী অসাধারণ উচ্চারণ রাসূলের (সা)!

কী এক দরদভরা কণ্ঠ দয়ার নবীজীর (সা)!

অপূর্ব এক বিস্ময়ে ভরা জীবন ছিল হযরত জাফরের!

যেন নীলে ঢাকা বিশাল আকাশ।–

সেই আকাশের বুকে জেগে আছে সোনার থালার চেয়েও উজ্জ্বল এক গ্রহ!

যখন ঘুমিয়ে আছে পৃথিবী। যখন ঘুমিয়ে আছি আমি এবং সকলেই। তখনো তিনি– সেই সোনার গ্রহ– হযরত জাফর জেগে আছেন, উড়ছেন এবং হাসছেন!

আমরা কি তার সেই হাসির শব্দ শুনতে পাই?

আমরা কি তার সেই উজ্জ্বল বাহু দু'টি দেখতে পাই?
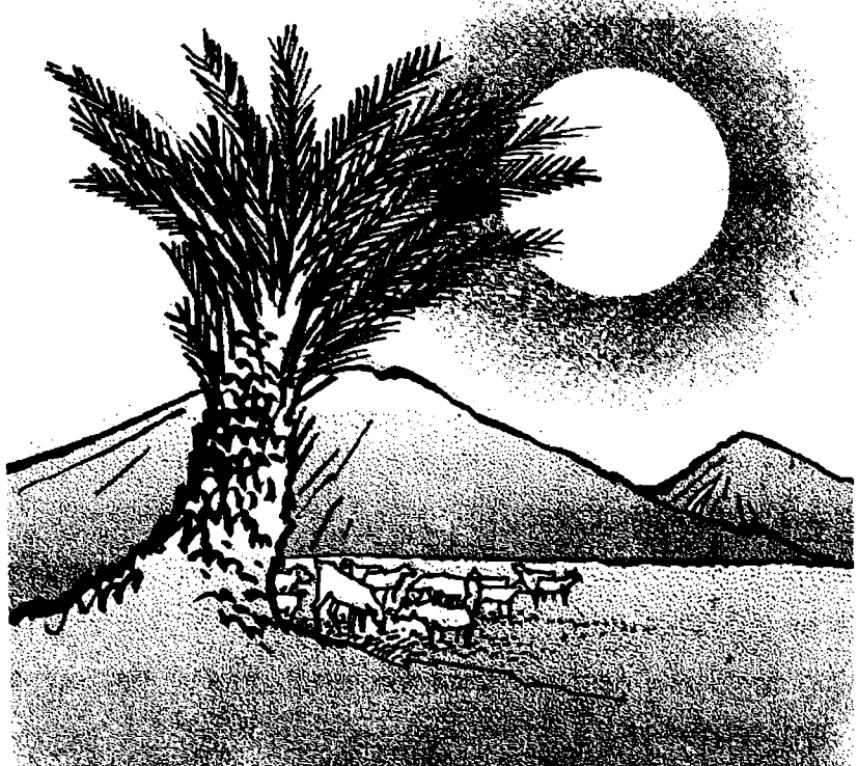
রাসূলের (সা) নির্দেশ মত, আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান মত চললেই কিন্তু আমরা সে সবই দেখতে পাব। দেখতে পাব আমাদের অনুভবে, আমাদের সবুজ হৃদয়ে। চোখ বন্ধ করলেই কিংবা ঘুমের মধ্যেও দেখতে পাব সেই সোনালি গ্রহের ছায়া।

এর জন্য আমাদের প্রয়োজন কেবল রাসূলের (সা) পথ অনুসরণ করা এবং জাফরের মত সর্বস্ব ত্যাগের এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। কাজটি হয়তো সহজ নয়।–

কিন্তু তাই বলে আবার অসাধ্যও কিছু নয়।

আল্লাহর খুশি ছাড়া, রাসূলের (সা) ভালোবাসা ছাড়া আমাদের আর কিইবা চাইবার থাকতে পারে?

আর এমন কিইবা আছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খুশির চেয়ে মূল্যবান?

হযরত জাফরের মত আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে গ্রহ কিংবা গ্রহের ছায়া হয়ে ওঠা– সত্যিই এক দারুণ সৌভাগ্যের ব্যাপার।■

www.icsbook.info

রূপালি চাঁদ রাখাল রাজা

ছেলেটি ছায়ার মত শান্ত।

শান্ত এবং স্থির।

সরলতাটুকু জোছনার মত লেপ্টে থাকে তার সমস্ত চেহারায়।

সরল। কিন্তু আবার চরিত্রের দিক দিয়ে উহুদ পর্বতের মত দৃঢ়। এতটুকুও টলে না তার হৃদয়। টলে না কোনো মোহে কিংবা স্বার্থের হাতছানিতে।

www.icsbook.info

চোখ দুটো হরিণের চোখের মত তীক্ষ্ণ। ভালো-মন্দের পার্থক্যটা ততোদিনে বুঝে গেছেন, আলো আর আঁধারের মত। আর আমানতের দিক থেকে সে আবার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

খুব কম বয়স।

বয়সে কিশোর তবু বিবেকের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ কয়ার মত ভরপুর।

উকাবার ছাগল চরান কিশোরটি।

ছাগলের পাল নিয়ে তিনি বেরিয়ে যান ভোর-সকালে।

সারাটি দিন কেটে যায় তার মাথার ওপর দিয়ে। মরুভূমির উত্তপ্ত বালু, পাথরের নুড়ি আর মরুঝড়ের সাথে তার বন্ধুত্ব। আর ভালোবাসা যত, সে কেবল উকাবার আমানত– ছাগলের পাল।

আজও ছাগল চরাচ্ছেন তিনি।

পশুগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে তাদের ক্ষুধার খাদ্য। আর পরিতৃপ্তির সাথে সেই দিকে তাকিয়ে আছেন কিশোর বালক। ভাবছেন, আহ কী চমৎকার দৃশ্য! এই মরুভূমিতেও কোন্ সেই মহান স্রষ্টা আহার্য রেখে দিয়েছেন এইসব অবুঝ প্রাণীর জন্য?

ভাবছেন আর মাঝে মাঝে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন ধু-ধু মরুভূমি, দিগন্ত বালিরেখা, আর বৃষ্টিহীন, মেঘহীন স্বচ্ছ আকাশ।

দূর থেকে, বহু দূর থেকে কারা যেন এগিয়ে আসছেন তার দিকে।

খুব ভালো করে দেখা যাচ্ছে না তাদের চেহারা।

কারা আসছেন গনগনে বালির তরঙ্গ ভেঙে।

খুব উৎসাহের সাথে সেদিকে তাকিয়ে অপেক্ষায় আছেন কিশোর বালক।

অপেক্ষার পালা শেষ।

ধুলো উড়িয়ে একসময় তার খুব কাছাকাছি চলে এলেন দু'জন আগন্তুক।

তাঁদের চেহারায় রয়ে গেছে আত্মমর্যাদার গোলাপি শোভা।

কিন্তু বোঝাই যায়, তারা বড় ক্লান্ত। ক্লান্ত এবং পিপাসার্ত।

www.icsbook.info

সন্দেহ নেই, তারা এসেছেন বহু কষ্টের মরুপথ পাড়ি দিয়ে।

তাদের ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। কণ্ঠও চুপসে গেছে শুকনো বেলুনের মত।

খুব কষ্টে কেবল উচ্চারণ করলেন :

আমরা তৃষ্ণার্ত। পিপাসায় কলিজাটা শুকিয়ে গেছে। আর পারছি না। তুমি কি আমাদেরকে একটু সাহায্য করবে?

— কিভাবে? কিশোর জিজ্ঞেস করলেন।

— কেন, তোমার এই ছাগলের পাল থেকে কিছু দুধ দুইয়ে আমাদেরকে পান করতে দাও। দেখছি তো, কত ছাগীর ওলান ভরে আছে দুধে। তা থেকে কিছুটা দিলেই আমরা আমাদের কষ্টদায়ক পিপাসা মেটাতে পারি।

www.icsbook.info

– অসম্ভব! এটা কিছুতেই সম্ভব নয় হে সম্মানিত মেহমানবৃন্দ! আপনাদের কষ্ট আমি বুঝতে পারছি। এই দুঃসময়ে আপনাদের খেদমত করতে পারলে আমি নিজেকেও ধন্য মনে করতাম। কিন্তু সেটা যে আমার পক্ষে সম্ভব নয়! আমি তো নিতান্তই নিরুপায়।

– নিরুপায়! তার মানে? এই তো কত ছাগল চরে বেড়াচ্ছে আমাদের সামনে। তবু তুমি এমন কথা বলছো কেন?

– বলছি এই কারণে যে, এই ছাগলগুলোর একটিও আমার নয়। আমি এগুলোর রাখাল। এর আমানতদার মাত্র। আর এজন্যই আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সম্ভব নয় মালিকের হুকুম ছাড়া কোনো ছাগীর বাট থেকে দুধ দুইয়ে আপনাদের পিপাসা মেটানো।

কিশোরটির কথায় এতটুকুও রেগে গেলেন না তাঁরা। বরং কী এক আনন্দ আর খুশির রেখা ফুটে উঠলো তাঁদের চোখে-মুখে।

দু'জনের মধ্যেই একটি অবাক বিস্ময় আর কৌতূহল কেবলই দুলে দুলে উঠছে।

খুব ভালো করে তাকালেন কিশোরটির দিকে। দেখলে বয়সে ছোট হলেও দীপ্তিতে ঝলমল ছেলেটির অন্য এক সুদৃঢ় অবয়ব। মরুর রুক্ষ লুহাওয়ার সাধ্য নেই কিশোরটির মুখ থেকে সেই দীপ্তির ঝলক কেড়ে নেবার।

দারুণ খুশি হলেন তাঁরা।

কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন রাখালটির দিকে। তারপর তাদের থেকে একজন হেসে বললেন :

– ঠিক আছে। যেসব ছাগীর বাটে দুধ আছে, সেগুলোর তো তুমিই আমানতদার। কিন্তু যে ছাগীর বাটে এখনও দুধ আসেনি, সেগুলো?

– সেগুলো? অবাক কণ্ঠ রাখালের। যে ছাগীর এখনও বাচ্চাই হয়নি তার বাটে দুধ আসবে কী করে? আর এমন ছাগী দিয়েই বা কী হবে?

আবারও হাসলেন তিনি। বললেন :

www.icsbook.info

– হ্যাঁ, সেই রকম একটি ছোট ছাগী হলেই চলবে। যার এখনও বাচ্চাই হয়নি।

তাঁর কথার মধ্যে এমন এক ধরনের আকর্ষণ ও মাধুর্য ছিল, যা কেবল শুনতেই ইচ্ছা করে।

তাঁর মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কিশোর রাখাল। যতই দেখেন, ততোই মুগ্ধ হন।

– কী হলো, দেবে? একটি ছোট ছাগী দিলেই হবে।

তাঁর এই উচ্চারণে রাখাল ইশারা করলেন সামনের দিকে।

রাখালের অনুমতি পেয়ে বিশাল পাল থেকে তিনি ধরে আনলেন তেমনি একটি ছোট ছাগী, যার এখনও বাচ্চা হয়নি। হওয়া সম্ভবও নয়।

এবার রাখালের কেবল দেখার পালা। তিনি কী করেন এই ছাগীটি নিয়ে।

কৌতূহল দৃষ্টি নিয়ে তিনি তাকিয়ে আছেন সেই অবাক পুরুষটির দিকে।

আর তিনি, সেই অবাক পুরুষ- ছোট্ট ছাগীটির বাটে হাত রেখে উচ্চারণ করলেন :

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।'

আর কী আশ্চর্য!

তাঁর হাতের স্পর্শেই সাথে সাথে দুধে ফুলে উঠলো সেই ছোট্ট ছাগীটির বাট।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছেন না রাখাল।

ভাবছেন, এও কি সম্ভব? এত ছোট্ট ছাগী, যার কোনো বাচ্চাই হয়নি, তার বাটে দুধ? কী করে বিশ্বাস করা যায়?

বিশ্বাস না করেও তো উপায় নেই। কারণ সত্যটা যে সামনেই। শুধু সামনেই নয়, নিজের হাতের নাগালে। এমন সত্যকে অস্বীকার করবে কে?

সেই এক অবাক পুরুষ!

www.icsbook.info

তিনি ছাগীটির বাটে হাত রাখছেন আর ঝর্ণাধারার মত ঝরঝর করে গড়িয়ে পড়ছে কেবল ধবধবে সাদা সুস্বাদু ঘন দুধ।

দ্বিতীয়জন একটি পাত্র ধরে আছেন বাটের নিচে।

দুধ ঝরছে একাধারে।

ঝরতে ঝরতে মুহূর্তেই ভরে উঠলো পাত্রটি।

প্রথমে তাঁরা দু'জনই তৃপ্তিসহকারে, যতটুকু প্রয়োজন ছিল, ততোটুকু পান করলেন। তারপর সেই দুধ পানের জন্য আহ্বান জানালেন রাখালটিকে।

তাঁর আহ্বানে রাখালও পান করলেন সেই দুধ পেট ভরে।

পান করলেন বটে, কিন্তু তার সারা শরীরে তখনও পিল পিল করে হেঁটে যাচ্ছে বিস্ময়ের পিঁপড়ার ঝাঁক। ভাবছেন, এটা কিভাবে সম্ভব!

সবাই যখন দুধপানে পরিতৃপ্ত, তখন সেই জ্যোতির্ময়ী পুরুষ– এবার তিনি সেই ছাগীর বাট লক্ষ্য করে বললেন : 'চুপসে যাও।'

এবং কী বিস্ময়ের ব্যাপার!

এই কথার সাথে সাথেই ছাগীর বাটটি আবার আগের মত চুপসে গেল।

রাখালটি তাঁকে অনুরোধ করলেন :

আপনি যে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন, তা কি আমাকে শিখিয়ে দেবেন?

জবাবে তিনি বললেন ঃ

'তুমি তো শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক।'

শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক?

চমকে উঠলেন রাখাল।

তার বিস্ময়ের চমকে আলোকিত হয়ে উঠলো চারপাশ।

কেনই বা হবে না!

যিনি তাঁকে এই সার্টিফিকেট দিলেন, তিনি তো আর কেউ নন– স্বয়ং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাথে যিনি আছেন তিনি হযরত আবু

www.icsbook.info

বকর। আর যার সম্পর্কে রাসূল (সা) এই কথাটি উচ্চারণ করলেন- তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ।

ইসলামের প্রথম দিক।

কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ রাসূল (সা)। তাই হযরত আবু বকরকে (রা) সাথে নিয়ে কুরাইশদের অত্যাচার আর উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য নির্জন গিরিপথে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি।

এইভাবেই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ দেখা পেলেন রাসূলের (সা)।

রাসূল (সা) এবং আবু বকরকে (রা) দেখা মাত্রই খুব ভাল লেগে গেল তার।

আবার তাকে দেখামাত্রই রাসূলেও (সা) ভাল লাগলো। তিনি মুগ্ধ হলেন এমন একটি কিশোর রাখালের সততা, নিষ্ঠা এবং আমানদারিতে।

সেইতো শুরু।

তারপরই ইসলাম গ্রহণ করলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। আর কালে কালে তিনিই তো হয়ে উঠলেন রাসূলের পরশে এক আলোকিত সোনার মানুষ।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছিলেন একজন রাখাল।

ইসলাম গ্রহণের পর, সেই কিশোর বয়সেই তিনি এবার নিজেকে উৎসর্গ করে দিলেন ইসলামের খেদমতে, রাসূলের (সা) কাছে।

রাসূলও (সা) তাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করলেন খাদেম হিসেবে।

সেইদিন থেকে এই সৌভাগ্যবান 'শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক'টি ছাগলের রাখাল থেকে পরিণত হলেন সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠতম রাসূলের (সা) খাদেম।

রাসূলের (সা) খেদমতের জন্য আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ তাঁর সাথে থাকতেন ছায়ার মত।

রাসূলের (সা) সফরে, ইকামতে, বাড়ির ভেতরে, বা বাইরে- সকল সময় তিনি রাসূলের (সা) সাথে থাকতেন। রাসূল (সা) ঘুমিয়ে গেলে সময় মত জাগিয়ে দিতেন। তাঁর গোসলের সময় পর্দা করতেন। বাইরে যাবার সময় জুতা পরিয়ে দিতেন। আবার ঘরে ফিরলে জুতা খুলে দিতেন। রাসূলের (সা) মেসওয়াক এবং লাঠিও তিনি বহন করতেন।

www.icsbook.info

রাসূল (সা) যখন একান্তে ঘরে বিশ্রাম করতেন, তখনও তিনি সেখানে যাতায়াত করতেন।

রাসূল এ ধরনের অবাধ যাতায়াতের অধিকারও দিয়েছিলেন তাকে।

রাসূলের (সা) সংস্পর্শে থাকার কারণে এবং নবীর (সা) গৃহে প্রতিপালিত হবার কারণে তিনি নবীর (সা) শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। নবীর (সা) আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য-এসবই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ খোদ রাসূলের (সা) শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। এ কারণে তাকে বলা হতো :

হিদায়াতপ্রাপ্ত, আচার-আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তিনিই হচ্ছেন রাসূলের (সা) নিকটতম ব্যক্তি।

রাসূলের (সা) সাহাবীদের মধ্যে কুরআনের যারা সবচেয়ে ভালো পাঠক, তার ভাব ও অর্থের সবচেয়ে বেশি সমঝদার এবং আল্লাহর আইন ও বিধি-বিধানে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ, তিনি ছিলেন তাদেরই একজন, অন্যতম।

রাসূল (সা) নিজেই বলতেন :
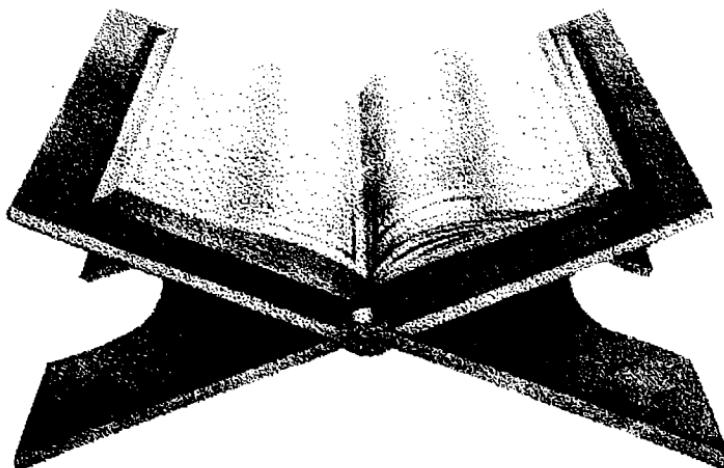
যে ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করে আনন্দ পেতে চায়, যেমন তা অবতীর্ণ হয়েছে– সে যেন ইবন উম্মুল আবদের [আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ] পাঠের অনুসরণে পাঠ করে।

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদও বলতেন ঃ

যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, সেই আল্লাহর কসম! আল্লাহর কিতাবের এমন কোনো একটি আয়াতও নাজিল হয়নি যে সম্পর্কে আমি জানি না যে, তা কোথায় নাজিল হয়েছে এবং কী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমার থেকে অধিক পারদর্শী কোনো ব্যক্তির কথা আমি যদি জানতে পারি এবং তার কাছে পৌঁছা সম্ভব হয়, তাহলে আমি তার কাছে উপস্থিত হই।

এই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদই আবার সাহসের দিক থেকে ছিলেন অসাধারণ।

রাসূলের (সা) সাহাবীরা একদিন মক্কায় একত্রিত হলেন।

www.icsbook.info

তারা সংখ্যায় খুবই অল্প। নিজেরা বলাবলি করছেন, আল্লাহর শপথ! প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে কুরাইশদেরকে কখনও শুনানো হয়নি। তাদেরকে কুরআন শোনাতে পারে এমন কে আছে?

তাদের মধ্য থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন একজন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ। বললেন, আমি–আমিই কুরাইশদেরকে কুরআন শোনাতে চাই।

– তুমি? তোমার ব্যাপারে আমাদের ভয় হচ্ছে। যদি ওরা তোমাকে শাস্তি দেয়? আমরা এমন একজনকে চাইছি, যার লোকজন আছে, যার ওপর কুরাইশরা অত্যাচার করতে সাহস পাবে না।

– না, আমাকেই অনুমতি দিন। আল্লাহ আমাকে হিফাজত করবেন। একথা বলে তিনি মাকামে ইবরাহীমের কাছে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে তিলাওয়াত শুরু করলেন :

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আররাহমান আল্লামাল কুরআন, খালাকাল ইনসানা আল্লামা হুল বায়ান।' ...

থমকে গেল কুরাইশরা।

একি! এ যে মুহাম্মাদ যা পাঠ করে, তাই!

কুরাইশরা মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। তারপর তার মুখের ওপর আঘাত করতে শুরু করলো। সে কী মার!

www.icsbook.info

রক্তাক্ত হয়ে ফিরে এলেন তিনি সঙ্গীদের মাঝে।

সঙ্গীরা বললেন, আমরা এটাই আশঙ্কা করেছিলাম।

সহজ ভঙ্গিতে জবাব দিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ :

আল্লাহর কসম! আল্লাহর শত্রুরা এখন আমার কাছে আজ এত তুচ্ছ, যা আগে ছিল না। আপনারা চাইলে আমি আগামীকালও এমনটি করতে পারি।

– না, তার আর দরকার নেই। যথেষ্ট হয়েছে। তাদের অপছন্দনীয় কথা এই প্রথম তুমিই তাদেরকে শুনিয়ে দিয়েছ।

শুধু একবার নয়। এভাবে বহুবারই তিনি কুরাইশদের অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। হয়েছেন রক্তাক্ত এবং ক্ষত-বিক্ষত।

কিন্তু না, এতটুকুও তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। কিংবা এতটুকু চিড় ধরেনি তার সাহসে।

বরং বাধা এবং অত্যাচার যতই কঠিন হয়েছে, ততোই দৃঢ় হয়েছে তার সাহস আর ঈমানের শক্তি।

রাসূলের (সা) সাথে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধেই অংশ নিয়েছিলেন তিনি। এবং অসীম সাহসের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।

হুনাইনের যুদ্ধের সময়।

কাফিরদের অতর্কিত আক্রমণে মুসলিম বাহিনীর দশ হাজার সৈন্য বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

মাত্র আশিজন যোদ্ধা জীবনবাজি রেখে রাসূলকে (সা) ঘিরে রাখেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি। এই যুদ্ধে রাসূল যে একমুঠো ধূলি নিয়ে নিক্ষেপ করেন কাফিরদের দিকে, সেই ধূলি রাসূলের (সা) হাতে তুলে দিয়েছিলেন এই দুঃসাহসী যোদ্ধা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ।

কী অসাধারণ এক সৌভাগ্যবান পুরুষ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ!

যেন রূপালি চাঁদ, রাখাল রাজা!■

www.icsbook.info

বৈরী বাতাসে সাঁতার

দু'জনই বেড়ে উঠছেন একই সাথে।

দু'জনের বয়স প্রায় একই।

তবুও একজন চলেছেন আলোকিত সূর্যের পথে।

আর অপর জনের পথটি ভয়ানক পিচ্ছিল। চারপাশ থকথক করছে এক দুর্বিষহ গাঢ় অন্ধকার।

www.icsbook.info

দু'জনই পরম আত্মীয়।

সম্পর্কে চাচা-ভাতিজা।

কিন্তু তখনও দু'জনের পথ বয়ে গেছে দুই দিকে। একজন- প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)।

আর অপরজন- আব্বাস ইবনুল মুত্তালিব।

আব্বাস সমবয়সী হলেও সম্পর্কে ছিলেন রাসূলের (সা) চাচা।

ইসলামের দাওয়াত তখন চলছে প্রকাশ্যভাবে।

রাসূল (সা) সবাইকে ডাকছেন- আল্লাহর পথে। ইসলামের পথে। সত্যের পথে।

তাঁর আহ্বানে একে একে ভারী হয়ে উঠছে মুসলমানদের সংখ্যা।

অন্ধকার থেকে ফিরে আসছে তারা আলোর পথে। বুকটা জুড়িয়ে নিচ্ছে ঈমানের শীতল পানিতে।

আহ্ কী আরাম!

বহুকালের তৃষিত হৃদয় তাদের মুহূর্তেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

চাচা আব্বাস।-

তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন ভাতিজা মুহাম্মাদকে (সা)।

কিন্তু তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাই বলে মক্কার অন্যান্য হিংস্রদের মত তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তেড়েও আসেননি। কোনোদিন বার করেননি তার ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের নখর।

আশ্চর্যের কথাই বটে!

নিজে ইসলাম গ্রহণ না করেও তিনি সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন রাসূলকে (সা)।

বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন ইসলামের দাওয়াত চারপাশে ছড়িয়ে দেবার জন্য।

তার সাহায্য-সহযোগিতার সেই দৃষ্টান্তও ছিল বিস্ময়কর।

হজ্জের মৌসুম।

www.icsbook.info

মদীনা থেকে বাহাত্তর জন আনসার মক্কায় এলেন। তারা একত্রিত হয়েছেন মিনার একটি গোপন শিবিরে।

সবাই রাসূলের (সা) হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে আহ্বান জানালেন :

হে দয়ার নবীজী! মক্কাবাসীরা আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। চলুন, আপনি আমাদের সাথে মদীনায় চলুন। আমরা আপনাকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

আব্বাস তখনও মুসলমান হননি।

কিন্তু অবাক কাণ্ড!

তিনিও উপস্থিত ছিলেন এই গোপন শিবিরে।

আনসারদের আহ্বান খুব মন দিয়ে শুনলেন আব্বাস। তারপর তাদেরকে বললেন :

"হে খাযরাজ কওমের লোকেরা!

আপনাদের জানা আছে, মুহাম্মাদ (সা) স্বীয় গোত্রের মধ্যে সম্মান ও মর্যাদার সাথেই আছেন। শত্রুর মুকাবেলায় সর্বক্ষণ আমরা তাঁকে হেফাজত করেছি। এখন তিনি আপনাদের কাছে যেতে চান। যদি আপনারা জীবনবাজি রেখে তাঁকে সহায়তা করতে পারেন তাহলে খুবই ভাল কথা। অন্যথায় এখনই সাফ সাফ বলে দিন।"

থামলেন আব্বাস।

তার কথাটা গুরুত্বের সাথে ভাবলেন তারা। তারপর বললেন, হ্যাঁ! আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি। রাসূল (সা) আমাদের কাছে পূর্ণ হিফাজতেই থাকবেন। আমরা তো আছিই তাঁর চারপাশে।

তাদের আশ্বাসের মধ্যে ছিল না কোনো খাঁদ। ছিল না কোনো ফাঁকি বা চালাকিও।

এর কিছুদিন পরই নবী (সা) হিজরতের অনুমতি পেলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে।

দয়ার নবীজী মক্কা ছেড়ে চলে গেলেন মদীনায়।

নবীজী মদীনায় আছেন।

ইতোমধ্যে বদর যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে।

আব্বাস তখন মক্কায়।

www.icsbook.info

কী নির্মম পরিহাস!

মক্কার কুরাইশদের অবর্ণনীয় চাপের মুখে আব্বাসকেও রাসূলের (সা) প্রতিপক্ষে লড়াই করতে যেতে হলো বদর প্রান্তরে।

কী নিষ্ঠুর দৃশ্য!

প্রাণপ্রিয় ভাতিজার বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরতে হচ্ছে চাচা আব্বাসকে!

কিছুতেই তিনি এটা মেনে নিতে পারছেন না।

পরিস্থিতি এমনই যে তিনি অন্য কিছু করতেও পারছেন না। সেই এক কঠিনতম অবস্থা!

বদর মানেই তো কঠিন পরীক্ষার ক্ষেত্র।

যুদ্ধ চলছে তুমুল গতিতে।

যুদ্ধ চলছে মুসলিম আর মুশরিকদের মধ্যে।

কিন্তু আল্লাহর রহমতে শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে বিজয়ী হলেন– সত্যেক সৈনিক মুসলিম বাহিনী।

বদরে মুশরিকদের সাথে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আব্বাস কেন যোগ দিয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণ জানতেন দয়ার নবীজী। এজন্য তিনি আগেই বলে রেখেছিলেন তাঁর সাথীদেরকে– "যুদ্ধের সময় আব্বাস বা বনু হাশিমের কেউ সামনে পড়লে তাদেরকে হত্যা করবে না। কারণ, জোরপূর্বক তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনা হয়েছে।"

যুদ্ধ শেষ।

মুসলমানদের হাতে বন্দী হলেন মুশরিকদের সাথে আব্বাস, আকীল ও নাওফিল ইবনে হারিস।

নিয়ম অনুযায়ী সকল বন্দীকেই বেঁধে রাখা হয়েছে। তার ভেতরে আছেন আব্বাসও।

কিন্তু অন্যদের চেয়ে আব্বাসের বাঁধনটি ছিল অনেক বেশি শক্ত। এত শক্তভাবে তাকে বাঁধা হয়েছিল যে তিনি বেদনায় কেবলই কঁকিয়ে উঠছিলেন।

www.icsbook.info

রাতে ঘুমিয়ে আছেন নবী মুহাম্মাদ (সা)!

হঠাৎ এক কাতর কণ্ঠের আর্তচিৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সাহাবারা রাসূলের (সা) ঘুমের ব্যাঘাতের কথা ভেবে আব্বাসের বাঁধনটা ঢিলা করে দিলেন।

থেমে গেল তার যন্ত্রণাদায়ক কঁকানি।

রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার! আর কোনো কাতর কণ্ঠস্বর শুনছি না কেন?

তারা বললেন, বাঁধন ঢিলা করে দিয়েছি।

রাসূল (সা) সাথে সাথে নির্দেশ দিলেন : "সকল বন্দীর বাঁধনই ঢিলা করে দাও।"

ইনসাফ আর ইহ্সান কাকে বলে? রাসূলই (সা) তার উত্তম নিদর্শন।

বদর যুদ্ধে বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত হলো।

আব্বাসের আম্মা ছিলেন মদীনার আনসার গোত্র খাযরাজের কন্যা। এই কারণে খাযরাজ গোত্রের সবাই রাসূলের (সা) কাছে অনুরোধ করলো :

"আব্বাস তো আমাদেরই ভাগ্নে। আমরা তার মুক্তিপণ মাফ করে দিচ্ছি।"

তাদের প্রস্তাব একবাক্যে নাকচ করে দিলেন রাসূল। বললেন, না! তা কখনই হতে পারে না। কারণ এটা সাম্যের খেলাফ। বরং তিনি আব্বাসের মুক্তিপণের পরিমাণটা একটু বেশিই করে দিলেন। কারণ তিনি জানতেন, সেই অর্থ পরিশোধ করার ক্ষমতা তার আছে।

এত অর্থ?

বিস্মিত হয়ে আব্বাস অনুনয়-বিনয়ের সাথে তার অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। বললেন, "আমি তো অন্তর থেকে আগেই মুসলমান হয়েছিলাম। মুশরিকরা আমাকে বাধ্য করেছে এই যুদ্ধে অংশ নিতে।"

আব্বাসের কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন :

"অন্তরের অবস্থা আল্লাহপাকই ভাল জানেন। আপনার দাবি সত্য হলে আল্লাহই তার প্রতিদান দেবেন। তবে বাহ্যিক অবস্থার বিচারে আপনাকে

www.icsbook.info

কোনো প্রকার সুবিধা দেয়া যাবে না। আর মুক্তিপণ আদায়ে আপনার অক্ষমতাও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আমি জানি মক্কার উম্মুল ফজলের কাছে আপনি মোটা অংকের অর্থ রেখে এসেছেন।"

রাসূলের একথা শুনে আব্বাস বিস্ময়ের সাথে বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি ও উম্মুল ফজল ছাড়া আর কেউ এই অর্থের কথা জানে না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আপনি আল্লাহর রাসূল।"

সত্যি সত্যিই তিনি নিজের, ভ্রাতুষ্পুত্র আকীল এবং নাওফিল ইবনে হারিসের পক্ষ থেকে মোটা অংকের মুক্তিপণ আদায় করে বন্দিদশা থেকে মুক্তি লাভ করলেন।

মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে হযরত আব্বাস সপরিবারে মদীনায় হিজরাত করলেন।

রাসূলের (সা) খেদমতে হাজির হয়ে তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম কবুলের ঘোষণা দিলেন। সেই সাথে তিনি মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাসও শুরু করলেন।

হযরত আব্বাস।–

সেই আব্বাস এখন বদলে গেছেন সম্পূর্ণ।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তার পুরো জীবনটাই বিলিয়ে দিয়েছেন ইসলামের খেদমতে।

মক্কা বিজয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

হুনাইনের অভিযানে রাসূলের (সা) সাথে একই বাহনে আরোহী ছিলেন তিনি।

কী সৌভাগ্য তার!

বাহনের পিঠে বসেই তিনি বললেন :

"এ যুদ্ধে কাফেরদের জয় হলো এবং মুসলিম মুজাহিদরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো!"

রাসূল (সা) বললেন : 'আব্বাস! তীরন্দাজদের আওয়াজ দাও।'

আব্বাস আওয়াজ দিলেন জোর গলায় : 'তীরন্দাজরা কোথায়?'.....

কী আশ্চর্য!

www.icsbook.info

আব্বাসের এই তীব্র আওয়াজের সাথে সাথেই ঘুরে গেল যুদ্ধের মোড়।

শুধু হুনাইন নয়।

তায়েফ অবরোধ, তাবুক অভিযান এবং বিদায় হজেও অংশ নিয়েছিলেন দুঃসাহসী আব্বাস।

দুঃসাহসী, কিন্তু তিনিই আবার সত্যের পক্ষে কোমল। কোমল এবং বিনয়ী।

আব্বাস ছিলেন অত্যন্ত দানশীল, অতিথিপরায়ণ ও দয়ালু এক অসামান্য সোনার মানুষ।

তার সম্পর্কে হযরত সা'দও বলেছেন :

"আব্বাস হলেন আল্লাহর রাসূলের চাচা, কুরাইশদের মধ্যে সর্বাধিক দরাজ দিল এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি অধিক মনোযোগী। তিনি ছিলেন কোমল অন্তরবিশিষ্ট। দুআর জন্য হাত উঠালেই তার দুই চোখ থেকে গড়িয়ে পড়তো কেবল অশ্রুর বন্যা। এই কারণে তার দুআর একটি বিশেষ আছরও লক্ষ্য করা যেত।"

আর মর্যাদার দিক দিয়ে?

মর্যাদার দিক দিয়ে আব্বাস ছিলেন অসাধারণ।

স্বয়ং রাসূলে কারীমও চাচা আব্বাসকে খুব সম্মান করতেন। তার সামান্য কষ্টতেও দুঃখ পেতেন দয়ার নবীজী (সা)।

একবার কুরাইশদের একটি রূঢ় আচরণ সম্পর্কে রাসূলের কাছে আব্বাস অভিযোগ করলে রাসূল ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন :

"সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন! যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের জন্য আপনাদের ভালোবাসেন না, তার অন্তরে ঈমানের নূর থাকবে না।"

হযরত আব্বাসকে এমনই ভালোবাসতেন আর শ্রদ্ধা করতেন রাসূল (সা)।

কী অতুলনীয় রাসূলের সেই ভালোবাসা আর সম্মানের নিদর্শন!

একবার রাসূল (সা) একটি বৈঠকে কথা বলছেন হযরত আবু বকর এবং উমরের (রা) সাথে।

www.icsbook.info

এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন হযরত আব্বাস।

চাচাকে দেখেই রাসূল (সা) তাকে নিজের ও আবু বকরের মাঝখানে বসালেন। আর তখনই রাসূল (সা) তাঁর কণ্ঠস্বর একটু নিচু করে কথা বলা শুরু করলেন।

আব্বাস চলে গেলেন।

আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, "হে রাসূল! এমনটি করলেন কেন?"

রাসূল (সা) বললেন :

জিব্রাঈল আমাকে বলেছেন, "আব্বাস উপস্থিত হলে আমি যেন আমার কণ্ঠস্বর নিচু করি, যেমন আমার সামনে তোমাদের কণ্ঠস্বর নিচু করার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন।"

রাসূলে কারীমের (সা) পর, পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীন ও হযরত আব্বাসের মর্যাদা এবং সম্মানের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক।

হযরত উমর এবং হযরত উসমান (রা) ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার সম্মানার্থে ঘোড়া থেকে নেমে পড়তেন। বলতেন, "ইনি হচ্ছেন রাসূলের (সা) চাচা।"

হযরত আবু বকর একমাত্র আব্বাসকেই নিজের আসন থেকে সরে গিয়ে স্থান করে দিতেন।

হযরত আব্বাস!–

সাগর সমান এই মর্যাদা আর সম্মান কি তার এমনিতেই এসেছে?

এই মর্যাদা অর্জন করতে গিয়ে তাকে পাড়ি দিতে হয়েছে ঈমানের বিশাল দরিয়া। আর টপকাতে হয়েছে তার একের পর এক আগুন এবং ধৈর্যের উপত্যকা।

বৈরী বাতাসে সাঁতার কেটেই তো এক সময় এভাবে পৌছানো যায় প্রশান্ত এবং আলোকিত এক নির্ভরতার উপকূলে!■

www.icsbook.info

আলোর মানুষ ফুলের অধিক

যেমন গাছ, তেমন ফল– কথাটা সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়।

যেমন বিশাল বটবৃক্ষের ফল হয় খুব ছোট এবং মানুষের জন্য অখাদ্য। আবার একটি ছোট কাঁঠাল কিংবা আঙ্গুর গাছেও যেসব ফল হয়– তা যেমনি সুস্বাদু, তেমনি স্বাস্থ্যকর।

www.icsbook.info

কিন্তু তাই বলে মানুষের ক্ষেত্রেও যে এমনটি ঘটবে, তার কোনো মানে নেই। বরং এর উল্টোটাই হয়ে থাকে প্রায় ক্ষেত্রে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যেমন পিতা, তেমন তার পুত্র হয়ে থাকে। ব্যতিক্রম যে আদৌ নেই, তা নয়।

কিন্তু সাঈদ বলে কথা।

হযরত সাঈদ ইবন যায়িদ (রা)। তিনি তো ছিলেন সেই সৌভাগ্যবান বিরল পুরুষ, যিনি হযরত উমরের (রা) বোন ফাতিমার স্বামী ছিলেন এবং দু'জনই ইসলাম গ্রহণ করেন উমরের (রা) আগে। যখন রাসূল (সা) সবেমাত্র ইসলামের দাওয়াতে দেয়া শুরু করেছেন। সেই ইসলামের প্রথম ভাগেই।

কী খোশ নসীব!

সাঈদ এবং স্ত্রী ফাতিমা ইসলাম কবুল করেছেন।

তাদের চোখ থেকে জমাট অন্ধকার সরে গিয়ে সূর্যের সোনালি রোদ্দুর চিকচিক করছে।

বুক ভরে নিচ্ছেন তারা ঈমানের শীতল বাতাস।

চারপাশ ঘিরে আছে কেবল কল্যাণের নিয়ামত।

কিন্তু অন্যদের মতো, ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের ওপরও নেমে এলো নির্যাতনের স্টিম রোলার।

দলিত মথিত হন তারা। শরীরে নেমে আসে ব্যথাভার অবসাদ।

কিন্তু মনসাগরে দোলা দিয়ে যায় তখনও অন্য এক সাহসের ঢেউ।

প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যেও অনুভব করেন তারা হৃদয়ের এক অপার্থিব আরাম।

সেই প্রশান্তি, সেই আরাম, আর সেই সাহসের নাম- ঈমান।

হযরত উমর (রা)।

তখনও তিনি স্পর্শ করেননি আলোকিত পর্বত।

তখনও তিনি বঞ্চিত জোছনার দ্যুতি থেকে। তখনও তিনি দূরে, বহুদূরে প্রশান্তির বৃষ্টি থেকে।

www.icsbook.info

বরং তখনও তিনি ঠা ঠা রোদের ভেতর কেবলই ছুটে বেড়াচ্ছেন তৃষ্ণার পানির খোঁজে।

সেই পরিস্থিতিতে, উমরের জীবনে কী বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে গেল মুহূর্তেই।

ঐ ভগ্নিপতি সাঈদ আর বোন ফাতিমার কারণে তিনিও গোসল করে নিলেন ঈমানের পূতপবিত্র ঝর্ণাধারায়।

ঈমান গ্রহণের পর আগের সেই উমর (রা) কোন্ উমরে পরিণত হয়েছিলেন, সে কথা তো লেখা আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সাঈদের বদলে গেল জীবন মিশন।

তার যৌবনের সকল শক্তি সকল ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টা তিনি নিয়োগ করলেন কেবল ইসলামের খেদমতে।

সেখানে কোনো অলসতা ছিল না।

ছিল না কোনো ক্লান্তির ছাপ। কেবল কাজ আর কাজ।

কেবল চেষ্টার পর চেষ্টা।

ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য তার জীবনকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন একমাত্র আল্লাহর রাস্তায়।

রাসূলকে (সা) ভালোবেসে তিনি পূর্ণ করেছিলেন তার হৃদয়। দ্বিধাহীন, শঙ্কাহীন।

তিনি রাসূলের (সা) সামনে পেশ করে দিয়েছিলেন নিজেকে, নিজের জীবনকে। এটাই ছিল তার ভালোবাসার উত্তম নজরানা।

হযরত সাঈদ!

রাসূলের (সা) নির্দেশে সিরিয়ায় থাকার কারণে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেননি বদর যুদ্ধে।

কিন্তু এছাড়া আর প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি ছিলেন অন্যতম সাহসী মুজাহিদ।

পারস্যের কিসরা ও রোমের কাইসারের সিংহাসন পদানত করার ব্যাপারে হযরত সাঈদের ভূমিকা ছিল অসামান্য।

www.icsbook.info

মুসলমানদের সাথে তাদের যতগুলো যুদ্ধ হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিতে তিনি ছিলেন সক্রিয়।

তার সেইসব অবদানের কথা স্মরণীয় হয়ে আছে আজও।

সাঈদ (রা) নিজেই বলেছেন :

'ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমরা ছিলাম ছাব্বিশ হাজার বা তার কাছাকাছি।'

অন্যদিকে রোমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লাখ বিশ হাজার।

তারা অত্যন্ত দৃঢ়পদক্ষেপে পর্বতের মত অটল ভঙ্গিতে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। তাদের অগ্রভাগে বিশপ ও পাদ্রি-পুরোহিতদের একটি বিশাল দল।

হাতে তাদের ক্রুশখচিত পতাকা। মুখে প্রার্থনাসঙ্গীত। পেছন থেকে তাদের সাথে সুর মিলাচ্ছিল বিশাল শক্তিশালী বাহিনী

তাদের সেই সম্মিলিত কণ্ঠস্বর তখন মেঘের গর্জনের মত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল।

রোমান বাহিনীর এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখছেন মুসলিম বাহিনী।

রোমান বাহিনীর সংখ্যা বিপুল।

এই দৃশ্য দেখে মুসলিম বাহিনী কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন।

সেনাপতি আবু উবাইদা।

তিনি বিষয়টি বুঝতে পারলেন।

সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালেন এবং মুসলিম বাহিনীকে উজ্জীবিত করার জন্যে বললেন :

"হে আল্লাহর বান্দারা!

তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর। তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। তোমাদের পা-কে করবেন সুদৃঢ়।

হে আল্লাহর বান্দারা!

ধৈর্য ধারণ কর। ধৈর্য হলো কুফরী থেকে মুক্তির পথ। ধৈর্য হলো আল্লাহর রিজামন্দি হাসিলের পথ এবং যাবতীয় লজ্জা এবং অপমান প্রতিরোধক।

www.icsbook.info

তোমরা তীর বর্শা শাণিত করে ঢাল হাতে প্রস্তুত হও। হৃদয়ে আল্লাহর জিকির ছাড়া অন্য সকল চিন্তা থেকে বিরত থাকো। সময় হলে আমি তোমাদের যুদ্ধের জন্য নির্দেশ দেব ইনশাআল্লাহ।"

মুসলিম বাহিনীর ভেতর থেকে একজন বেরিয়ে আবু উবাইদাকে বললেন :

"আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই মুহূর্তে আমি কুরবানী করবো আমার জীবনকে। রাসূলের (সা) কাছে পৌঁছে দিতে হবে এমন কোনো বাণী কি আপনার আছে?"

আবু উবাইদা বললেন :

"হ্যাঁ আছে। রাসূলকে (সা) আমার ও মুসলিম বাহিনীর সালাম পৌঁছে দিয়ে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের রব আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন, তা আমরা সত্যিই পেয়েছি।"

সাঈদ বলেন,

'আমি তার কথা শুনা মাত্রই দেখতে পেলাম সে তার তরবারি কোষমুক্ত করে আল্লাহর শত্রুদের সাথে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হচ্ছে।

এই অবস্থায় আমি দ্রুত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে অগ্রসর হলাম এবং আমার বর্শা হাতে প্রস্তুত হলাম।

শত্রুপক্ষের প্রথম যে ঘোড় সওয়ার আমাদের দিকে এগিয়ে এলো, আমি তাকে আঘাত করলাম।

তারপর–

তারপর অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

আল্লাহ পাক আমার অন্তর থেকে সকল প্রকার ভয়ভীতি একেবারেই দূর করে দিলেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী রোমান বাহিনীর ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালালো। এবং তাদেরকে পরাজিত করলো।"

দিমাশক অভিযানেও অংশগ্রহণ করেন সাঈদ।

দিমাশক বিজয়ের পর আবু উবাইদা তাকে দেমাশকের ওয়ালী নিযুক্ত করলেন।

www.icsbook.info

তিনিই হলেন দিমাশকের প্রথম মুসলিম ওয়ালী।

কিন্তু হযরত সাঈদ জিহাদের চেয়ে তিনি এই উচ্চ পদকে মোটেও সম্মানজনক মনে করলেন না।

তিনি কাজ করেন। প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকেন। আর মনটা পড়ে থাকে তার জিহাদের ময়দানে।

তিনি আবু উবাইদাকে জানালেন হৃদয়ের সকল আকুতি। লিখলেন :

"আপনারা জিহাদ করবেন আর আমি বঞ্চিত হবো, এমন আত্মত্যাগ আর কুরবানী আমি করতে পারিনে। আমি শিগগিরই আপনার কাছে পৌঁছে যাচ্ছি।"

আবু উবাইদা বাধ্য হয়ে ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে দিমাশকের ওয়ালী নিযুক্ত করলেন এবং জিহাদের ময়দানে ফিরিয়ে আনলেন হযরত সাঈদকে।

এই হলেন হযরত সাঈদ। যিনি ছিলেন সাহসে ও সংগ্রামের এক জ্বলন্ত বারুদ।

কেন নয়!

তার পিতা যায়িদও যে ছিলেন একজন সাহসী, সত্যনিষ্ঠপুরুষ। তিনি যে তারই সন্তান!

যায়িদের সৌভাগ্য হয়নি রাসূলের (সা) খেদমতে নিজেকে পেশ করার। কারণ, তখনও নবী মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াতপ্রাপ্ত হননি।

কিন্তু যায়িদ, সেই জাহেলি যুগেও ছিলেন কলুষমুক্ত। ছিলেন রুচিসম্পন্ন, বুদ্ধিমান এবং সাহসী এক পুরুষ।

ইসলাম আগমনের আগেই তিনি নিজেকে দূরে রাখেন শিরক থেকে। কুফরী থেকে। পৌত্তলিকতা থেকে আর যত পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে।

নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে, 'বালদাহ' উপত্যকায় একবার রাসূলের (সা) সাথে তার সাক্ষাৎ হয়।

রাসূলের (সা) সামনে খাবার আনা হলে তিনি খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। যায়িদকে অনুরোধ করা হলে তিনিও অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন :

www.icsbook.info

"তোমাদের দেব-দেবীর নামে যবেহকৃত পশুর গোশত আমি খাইনে।"

এটা সেই জাহেলি যুগের কথা।

যখন আরবে কন্যা সন্তান হলে জীবিত কবর দেয়া হতো।

যায়িদ খোঁজ খবর নিতেন, কোথায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার খবর পেলেই তিনি সেখানে ছুটে যেতেন এবং সেই কন্যা সন্তানকে নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিতেন। তারপর সে বড় হলে তাকে নিয়ে যেতেন তার অভিভাবকের কাছে। বলতেন, "এখন একে নিজের দায়িত্বে রাখতেও পারো, অথবা আমার দায়িত্বেও ছেড়ে দিতে পারো।"

যায়িদ সারাজীবন সত্য দীনকে অনুসন্ধান করে ফিরছেন। এই সত্য দীনকে খুঁজতে তিনি কত জায়গায়ই না গিয়েছেন। একবার তিনি শামে (সিরিয়া) গিয়ে একজনের সন্ধান পেলেন। যিনি আসমানী কিতাবে অভিজ্ঞ। তার কাছে তিনি মনের বাসনার কথা খুলে বললেন। তিনি যায়িদকে বললেন :

– হে মক্কাবাসী ভাই! আমার মনে হচ্ছে আপনি দীনে ইব্রাহীম অনুসন্ধান করছেন?

– হ্যাঁ, তাই।

তিনি বললেন :

"আপনি যে দীনের অনুসন্ধান করছেন, আজকের দিনে তো তা আর পাওয়া যায় না। তবে সত্য আছে তো আপনার শহরেই। আপনার কওমের মধ্য থেকে আল্লাহ এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যিনি দীনে ইব্রাহীম পুনরুজ্জীবিত করবেন। আপনি যদি তাঁকে পান তাহলে তাঁরই অনুসরণ করবেন।"

রাহিবের একথা শুনার পর যায়িদ আবার মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন।

কোথায় সেই নবী?

কে সেই ভাগ্যবান মহাপুরুষ?

খুঁজতে হবে তাঁকে।

www.icsbook.info

যায়িদ দ্রুত হাঁটছেন।

মক্কার দিকে।

মক্কা থেকে বেশ কিছু দূরে যায়িদ।

তখনই মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াতপ্রাপ্ত হলেন।

কিন্তু আফসোস!

যায়িদ রাসূলের (সা) সাক্ষাৎ পেলেন না।

কারণ, মক্কায় পৌছার পূর্বেই একদল বেদুঈন ডাকাত তাকে আক্রমণ করলো। শুধু আক্রমণ নয়, শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যাও করলো।

ইন্তেকাল করলেন যায়িদ।

তিনি বঞ্চিত হলেন রাসূলের (সা) দর্শন, হিদায়াত এবং ইসলামের খেদমত থেকে।

অপূর্ণ রয়ে গেল তার হৃদয়ের বাসনা।

মৃত্যুর আগে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দুআ করলেন। বললেন :

"হে আল্লাহ! যদিও এই কল্যাণ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন, আমার পুত্র সাঈদকে তা থেকে আপনি মাহরুম করবেন না।"

মহান রাব্বুল আলামীন কবুল করেছিলেন পিতা যায়িদের সেই দুআ।
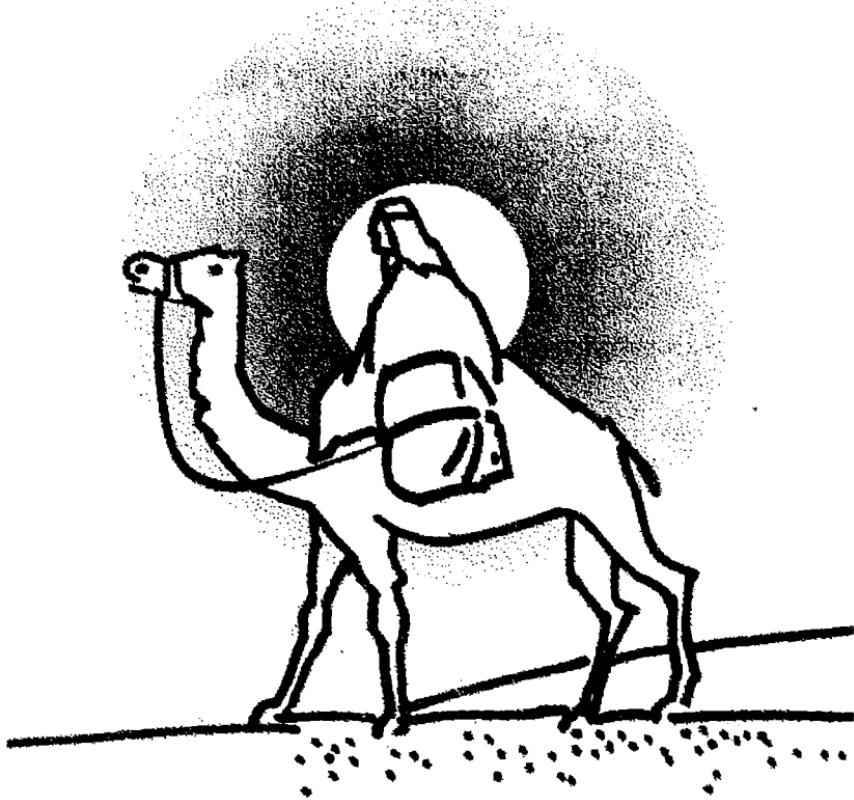
সত্যি সত্যিই তার পুত্র সাঈদ কল্যাণ লাভ করেছিলেন রাসূলের (সা) ভালোবাসা আর আল্লাহর দীনের পথে সার্বিক ত্যাগের মাধ্যমে।

যেমন পিতা, তেমনি তার পুত্র!

হযরত সাঈদ!

কী অসাধারণ এক বেহেশতের আবাবিল!

বেহেশতের আবাবিল, কিংবা তার চেয়েও বড়– আলোর মানুষ, ফুলের অধিক।■

www.icsbook.info

আঁধার লুটায় পায়ের নিচে

বিশাল হৃদয়ের এক মানুষ আবদুর রহমান ইবন আউফ।

যেমন তার ঈমানী দৃঢ়তা, তেমনি তার সাহস। কোমলতা, দানশীলতা আর মহানুভবতায় তিনি ছিলেন এক বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী।

কী অসাধারণ ছিল তার সেই হৃদয় উজাড় করা দানের মহিমা!

আত্মত্যাগের এক অনুপম স্বাক্ষর রেখে গেছেন আবদুর রহমান।

www.icsbook.info

রেখে গেছেন ইসলামের জন্য ব্যাকুল হৃদয়ের সোনালি পশরা।

রাসূল (সা) পেয়ে গেছেন তখন মহান পুরস্কার– নবুওয়াত।

তিনি তখন দাওয়াত দিচ্ছেন আশপাশে। পরিচিত মহলে।

চুপে চুপে ইসলাম গ্রহণ করছেন কেউ কেউ।

সেই প্রাথমিক পর্যায়ে যে ক'জন রাসূলের (সা) আহ্বানে সাড়া দিয়েছেলন, আবদুর রহমান ছিলেন তাদেরই একজন।

সেই তো প্রথম।

সেই তো প্রথম আত্মসমর্পণ করা আল্লাহর কাছে।

ইসলামের কাছে।

রাসূলের (সা) ভালোবাসার কাছে। না, আর একবারের জন্যও পেছন ফিরে তাকাননি তিনি।

সেই তো পথ চলা শুরু।

পথ চলা কেবল আলোর দিকে।

কল্যাণের দিকে।

সত্যের দিকে।

সেই চলার ছিল না কোনো বিশ্রাম। ছিল না কোনো ক্লান্তি।

আবদুর রহমান।

শেষ জীবনেও তিনি ছিলেন বিশাল সম্পদশালী। সম্পদশালী ছিলেন ঈমান এবং অর্থের দিক থেকেও।

কিন্তু প্রথম দিকে তিনি ছিলেন অতিশয় নিঃস্ব এবং দরিদ্র। অভাবের সাথে পাঞ্জা লড়তেন প্রায় প্রতিদিনই। একেবারেই খালি হাতে তিনি হিজরত করে পৌঁছেছিলেন মদীনায়।

কী দুঃসহ জীবনটাই না ছিল তখন! তবুও হতাশ নন আবদুর রহমান। বরং কঠিন প্রত্যয় এবং শ্রমের মাধ্যমে সেই তিনি– যিনি মদীনায় শুরু করে ছিলেন ঘি ও পনির বেচা-কেনার সামান্য ব্যবসা– কালে কালে তিনিই হয়ে

www.icsbook.info

উঠলেন তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর একজন সেরা ব্যবসায়ী এবং বিশাল সম্পদশালী ব্যক্তি।

চেষ্টা, সাধনা, পরিশ্রম আর আল্লাহর ওপর অপরিসীম আস্থা থাকলে কি-না হয়! আবদুর রহমানই তার সাক্ষী।

কিন্তু কিভাবে এমনটি হলো?

সেও এক আলোকিত অধ্যায় বটে।

সম্পদশালী, কিন্তু বখিল কিংবা কৃপণ ছিলেন না আবদুর রহমান।

তার সম্পদ দু'হাতে তিনি দান করেন আল্লাহর রাস্তায়। তার সম্পদ দ্বারা সমূহ উপকৃত হয় ইসলাম।

আল্লাহর রাসূল (সা) জানেন এসব।

জানবেন না কেন!

তিনিই তো নিজ চোখে দেখেন আবদুর রহমানের দানের কারিশমা। দয়ার নবীজী (সা) খুশি হন প্রিয় সাহাবীর এই অকুণ্ঠ উদারতায়। তিনি দোয়া করেন তার জন্য। হাত তুলে দোয়া করেন মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে। তার সম্পদ বৃদ্ধির জন্য।

রাসূলের (সা) দোয়া বলে কথা!

বৃথা যাবে কেমন করে?

মহান রাব্বুল আলামীন কবুল করলেন রাসূলের (সা) দোয়া।

দয়ার নবীজীর (সা) দোয়ার বরকতে আল্লাহর রহমতে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হলেন আবদুর রহমান।
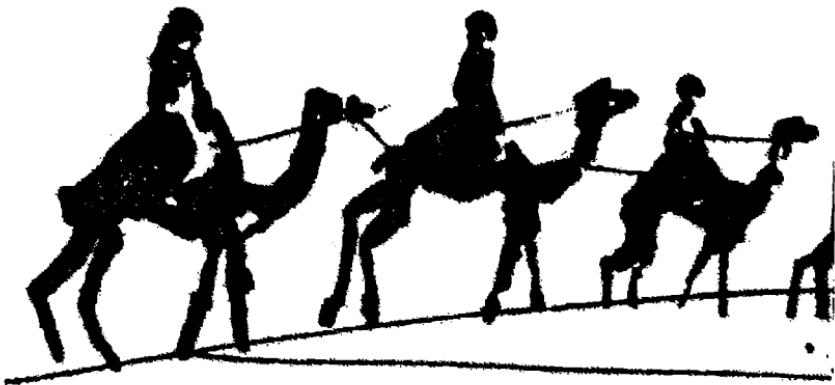
এত অর্থ! এত সম্পদ!

কিন্তু না, এসবের প্রতি সামান্যতম আকর্ষণও ছিল না তার। এই বিপুল সম্পদ তিনি দান করেছেন একমাত্র আল্লাহর রাস্তায়। সত্যের পথে। রাসূলের (সা) ভালোবাসার নজরানায়। মানুষ ও মানবতার কাজে।

একবার রাসূল (সা) ডাকলেন তার প্রিয় সাথীদের। বললেন,

"আমি একটি অভিযানে সৈন্য পাঠানোর ইচ্ছা করছি। তোমরা সাহায্য করো।"

www.icsbook.info

রাসূলের (সা) কথা শেষ হতেই এক দৌড়ে বাড়িতে এলেন আবদুর রহমান। তারপর দ্রুত, খুব দ্রুত ফিরে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে এই চার হাজার দীনার আছে। এর থেকে দু'হাজার করজে হাসানা দিলাম আমার রবকে। আর বাকি দু'হাজার রেখে দিলাম আমার পরিবার-পরিজনের জন্য।

রাসূল (সা) খুব খুশি হলেন। বললেন,

"তুমি যা দান করেছ এবং যা রেখে দিয়েছ, তার সব কিছুতেই আল্লাহ তা'য়ালা বরকত দান করুন।"

বিরাট শোরগোল পড়ে গেল মদীনায়। সবাই কানাকানি করছে, সিরিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য নিয়ে একটি বাণিজ্য কাফেলা উপস্থিত হয়েছে। শুধু উট আর উট।

জিজ্ঞেস করলেন হযরত আয়েশা (রা),

"এই সম্পদের বহর নিয়ে কে এলো? এই বাণিজ্য কাফেলাটি কার?"

উপস্থিত সকলেই জবাব দিল,

"কার আবার! আবদুর রহমানের।"

হযরত আয়েশা (রা) বললেন, "আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি, 'আবদুর রহমানকে আমি যেন সিরাতের ওপর একবার হেলে গিয়ে আবার সোজা হয়ে উঠতে দেখলাম।"

www.icsbook.info

আমি শুনেছি। রাসূল (সা) বলতেন,

"আবদুর রহমান হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

হযরত আয়েশার (রা) কথাটি সময়মত কানে গেল আবদুর রহমানের। তিনি আহত হলেন কিছুটা। দৃঢ়তার সাথে বললেন,

"ইনশাআল্লাহ আমাকে সোজা হয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে।"

এই আত্মবিশ্বাসের বাণী উচ্চারণের সাথে সাথেই তিনি তার উপার্জিত সকল বাণিজ্য-সম্পদ সাদকা করে দিলেন আল্লাহর রাস্তায়।

কী পরিমাণ ছিল সেই সম্পদ?

কেউ বলেন, পাঁচশো, কেউ বলেন সাত শো উটের পিঠে বোঝাই ছিল যত সম্পদ- তার সবই তিনি সাদকা করে দেন।

আবার কেউবা বলেন, শুধু সম্পদ নয়, সেই সাথে ঐ পরিমাণ উটের বহরকেও দান করে দিয়েছিলেন।

একবার তিনি চল্লিশ হাজার দীনারে বিক্রি করলেন তার কিছু জমি। বিক্রয়লব্ধ সম্পূর্ণ অর্থই তিনি বণ্টন করে দিলেন বনু যুহরা, মুসলমান, ফকির মিসকিন, মুহাজির ও আযওয়াযে মুতাহ্হারাতের মধ্যে।

তিনি মোট তিরিশ হাজার দাস মুক্ত করে দিয়েছেন। এটাও এক বিরল দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে।

www.icsbook.info

আবদুর রহমান ছিলেন রাসূলের (সা) ভালোবাসায় সিক্ত এক অনন্য অসাধারণ পুরুষ।

বিশাল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি জীবন যাপনে ছিলেন অতি সাধারণ। আল্লাহর সন্তুষ্টি, রাসূলের মহব্বত ছিল তার একমাত্র আরাধ্য বিষয়।

তিনি ছিলেন তাকওয়ার এক উজ্জ্বল নমুনা। মক্কায় গেলে তিনি তার আগের বাড়ির দিকে ফিরেও তাকাতেন না। কেউ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন,

"ওগুলি তো আমি আমার আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিয়েছি। ওদিকে তাকাব কেন?"

একবার তিনি দাওয়াত দিলেন তার বন্ধুদেরকে।

সময়মত সবাই হাজির হলেন তার বাড়িতে।

তিনিও বসে আছেন তাদের মধ্যে। ইতোমধ্যে খাবার এলো ভেতর থেকে। কত ভাল ভাল খাবার! এতসব আয়োজন কেবল বন্ধুদের জন্য। এত খাবার সামনে এলেই তিনি কান্না শুরু করলেন। ডুকরে কাঁদছেন আবদুর রহমান।

বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলেন,

"কাঁদছো কেন? কী হয়েছে?"

তিনি সেই কাঁদো স্বরেই জবাব দিলেন, "রাসূল (সা) বিদায় নিয়েছেন। তিনি নিজের ঘরে যবের রুটিও পেট ভরে খেতে পাননি।"

আর একদিন। তিনি রোযা ছিলেন। ইফতারের পর তার সামনে খাবার হাজির করলে তিনি অত্যন্ত ব্যথাভরা কণ্ঠে বললেন,

"মুসয়াব ইবন উমায়ের ছিলেন আমার থেকেও ভালো এবং উত্তম মানুষ। কিন্তু সেই সোনার মানুষটি শহীদ হলে তার জন্য মাত্র ছোট্ট একখানা কাফনের কাপড় পাওয়া গিয়েছিল। সেই কাপড়টি ছিল এতই ছোট যে তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যাচ্ছিল, আবার পা ঢাকতে গেলে মাথা আলগা হচ্ছিল। তারপর মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জন্য দুনিয়ার এইসব প্রাচুর্য দান করলেন। আমার ভয় হয়, না জানি আল্লাহ পাক আমাদের বদলা দুনিয়াতেই দিয়ে দেন!"

www.icsbook.info

কথাগুলি বলতে গিয়ে তিনি হাউমাউ করে শিশুদের মত জোরে কেঁদে ফেললেন।

কাঁদছেন আবদুর রহমান।

কাঁদছেন আল্লাহর ভয়ে।

আখিরাতের ভয়ে।

কিন্তু তিনি কেন কাঁদছেন?

তিনি তো সেই ব্যক্তি– যিনি নবম হিজরিতে, তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূলের (সা) হাতে তুলে দেন আট হাজার দীনার। তার এই অঢেল অর্থ দান করা দেখে কেউ কেউ মন্তব্য করলো, এটা তার বাড়াবাড়ি। কেবল লোক দেখানোর জন্য। সে একজন রিয়াকার।

তাদের জবাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আত্‌তাওবার ৭১ নং আয়াতে বললেন,

www.icsbook.info

"এতো সেই ব্যক্তি, যার ওপর আল্লাহর রহমত নাজিল হতে থাকবে।"

তার এই দানের বহর দেখে রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, "আবদুর রহমান, তোমার পরিবারের জন্য কিছু রেখেছ কি?"

তিনি জবাবে বললেন, "হ্যাঁ, রেখেছি হে দয়ার নবী (সা)! আমি যা দান করেছি, তার চেয়েও বেশি ও উৎকৃষ্ট জিনিস তাদের জন্য রেখে এসেছি।"

রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, 'কত?'

আবদুর রহমান বললেন, "আমার পরিবারের জন্য রেখে এসেছি তাই, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) যে রিজিক, কল্যাণ ও প্রতিদানের অঙ্গীকার করেছেন।"

সত্যের প্রতি তিনি ছিলেন পর্বতের মত সুদৃঢ়।

কোমল ছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) প্রতি।

কিন্তু তিনিই আবার ভীষণ ভয়ঙ্কর ছিলেন মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ছিলেন বৈশাখী ঝড়ের চেয়েও দুর্দম আর সমুদ্রের তুফানের চেয়েও ভয়ানক।

রাসূলের (সা) জীবদ্দশায় সংঘটিত বদর, উহুদ, খন্দকসহ প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি সাহসিকতার সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন।

তার তলোয়ারের ধার দিয়ে ঝরে পড়তো কেবল সাহসের ফুলকি।

উহুদের যুদ্ধে তার শরীরে জমে গিয়েছিল একত্রিশটি আঘাতের চিহ্ন।

তারপরও তিনি ছিলেন সেদিন বারুদস্ফুলিঙ্গ, কঠিন পর্বতশৃঙ্গ।

কেন নয়?

তিনি তো পান করেছিলেন রাসূলের (সা) হাত থেকে সেই এক সাহসের পানি, যে পানিতে ছিল কেবল আল্লাহর করুণার স্পর্শ।

ভয়ের কালিমা তাকে ছুঁয়ে যাবে, তা কেমন করে হয়!

বস্তুত, এমন সাহসী মানুষের পায়ের নিচেই তো হুমড়ি খেয়ে গড়াগড়ি যায় যত কুৎসিৎ আঁধার। আঁধারের ঢল।■

www.icsbook.info

হলুদ পাগড়ির শিষ

খুব কম বয়স।

একেবারেই কিশোর।

কিন্তু শরীরে যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি শক্তি। তাজি ঘোড়ার মত টগবগ করে ছুটে বেড়ান তিনি।

কাউকে পরোয়া করেন না।

www.icsbook.info

সাহসের তেজ ঠিকরে বের হয়ে আসে তার দেহ থেকে। সমবয়সী তো দূরে থাক, অনেক বড় পালোয়ানও হার মানে তার সাথে মল্লযুদ্ধে।

সে এক অবাক করার মত দুঃসাহসী শক্তিশালী কিশোর।

নাম যুবাইর ইবনুল আওয়াম।

রাসূলের (সা) দাওয়াতে তখন মুখরিত চারদিক।

নবীজীর ডাকে সাড়া দিতে দলে দলে লোক ছুটে আসছে তাঁর কাফেলার দিকে।

পুরো মক্কায় তখন ইসলামের দাওয়াতী আওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছে।

চারপাশে তার মৌ মৌ গন্ধ।

শান্তির সৌরভে ক্রমশ ভরে উঠছে বিশ্বাসীদের হৃদয়ের চাতাল।

যুবাইরও দেখছেন। দেখছেন আর শুনছেন ফিসফিস মধুর গুঞ্জন। তারও কানে বেজে উঠছে রাসূলের (সা) কণ্ঠ নিঃসৃত সেই মধুর এবং শাশ্বত ছন্দমুখর আহ্বান :

এসো আলোর পথে।

এসো সুন্দরের পথে।

এসো আল্লাহর পথে।

এসো রাসূলের (সা) পথে।

যুবাইরের বয়স তখন মাত্র ষোল।

বয়সে কিশোর। কিন্তু তার শরীরে বইছে যৌবনের জোয়ার। যে কোনো যুবকের চেয়েও তিনি অনেক বেশি সবল এবং সাহসী।

কান খাড়া করে যুবাইর শুনলেন রাসূলের (সা) আহ্বান।

আর দেরি নয়।

সাথে সাথে তিনি কবুল করলেন ইসলাম।

দয়ার নবীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এক পরম প্রশান্তির ছায়ায়।

www.icsbook.info

রাসূলও তাকে স্থান দিলেন স্নেহের বাহুডোরে।

রাসূলের (সা) প্রতি যুবাইয়ের ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। সেই ভালোবাসার কোনো তুলনা চলে না।

একবার কে যেন রটিয়ে দিল, মুশরিকরা বন্দী অথবা হত্যা করেছে প্রাণপ্রিয় নবীকে।

একথা শুনার সাথে সাথেই বয়স্কদের মত জ্বলে উঠলেন যুবাইর।

অসম্ভব! অসম্ভব এ দুঃসাহস! আমার নবীজীকে কেউ হত্যা করতে পারে না!

তিনি একটানে কোষমুক্ত করলেন তার তরবারি। তারপর যাবতীয় ভিড় ঠেলে, উর্ধশ্বাসে ছুটে গেলেন নবীজীর কাছে।

রাসূল তাকালেন যুবাইরের দিকে।

তিনি বুঝে গেলেন যুবাইরের হৃদয়ের ভাষা। তিনি হাসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে যুবাইর?

যুবাইরের ভেতর তখনও বয়ে যাচ্ছে ক্রোধের কম্পন। তিনি বললেন,

'হে রাসূল! খবর পেলাম, আপনি বন্দী অথবা নিহত হয়েছেন!'

রাসূল খুশি হলেন যুবাইরের আত্মত্যাগ আর ভালোবাসার নজির দেখে। তিনি খুশি হয়ে দোয়া করলেন তার জন্য।

এটাই ছিল প্রথম তরবারি, যা জীবন উৎসর্গের জন্য প্রথম একজন কিশোর কোষমুক্ত করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের কারণে যুবাইরের ওপরও নেমে এসেছিল অকথ্য নির্যাতন।

তার চাচা- যে চাচাকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন প্রাণ দিয়ে, সেও মুহূর্তে শত্রু হয়ে গেল কেবল সত্য গ্রহণের কারণে।

পাপিষ্ঠ চাচা!

নিষ্ঠুর চাচা!

www.icsbook.info

হিংস্র পশুকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল সে। গরম, উত্তপ্ত পাথর! যে পাথরের ওপর ধান ছিটিয়ে দিলেও খই হয়ে যায়। এমন গরম পাথরের ওপর চিৎ করে শুইয়ে দিত ভাতিজা যুবাইরকে। আর বলতো ইসলাম ত্যাগ করার জন্য।

কিন্তু একবার যে পেয়ে গেছে সত্যের পরশ, সে কি আর বিভ্রান্ত হতে পারে কোনো অত্যাচার আর নির্যাতনে?

না! যুবাইরও চুল পরিমাণ সরে আসেননি তার বিশ্বাস থেকে। তার সত্য থেকে। বরং নির্যাতন যত বেড়ে যেত, ততোই বেড়ে যেত তার আত্মবিশ্বাস আর সাহসের মাত্রা।

তিনি কঠিন সময়েও পরীক্ষা দিতেন ঈমান আর ধৈর্যের।

তিনি ছিলেন হরিণের চেয়েও ক্ষিপ্রগতি, আর বাঘের চেয়েও দুঃসাহসী।

বদর যুদ্ধে দেখা গেল যুবাইয়ের সেই ভয়ঙ্কর চেহারা।

মুশরিকদের জন্য সেদিন তিনি ছিলেন বিভীষিকার চেয়েও ভয়ানক।

সেদিন মুশরিকদের সুদৃঢ় প্রতিরোধ প্রাচীর ভেঙ্গে তছনছ করে দেন তিনি।

একজন মুশরিক সৈনিক কৌশলে উঠে গেছে একটি টিলার ওপর। সেখান থেকে সেই ধূর্ত চিৎকার করে যুবাইরকে আহ্বান জানালো মল্ল যুদ্ধের।

ইচ্ছা ছিল যুবাইরকে পরাস্ত করা।

তার আহ্বানে সাড়া দিলেন যুবাইর।
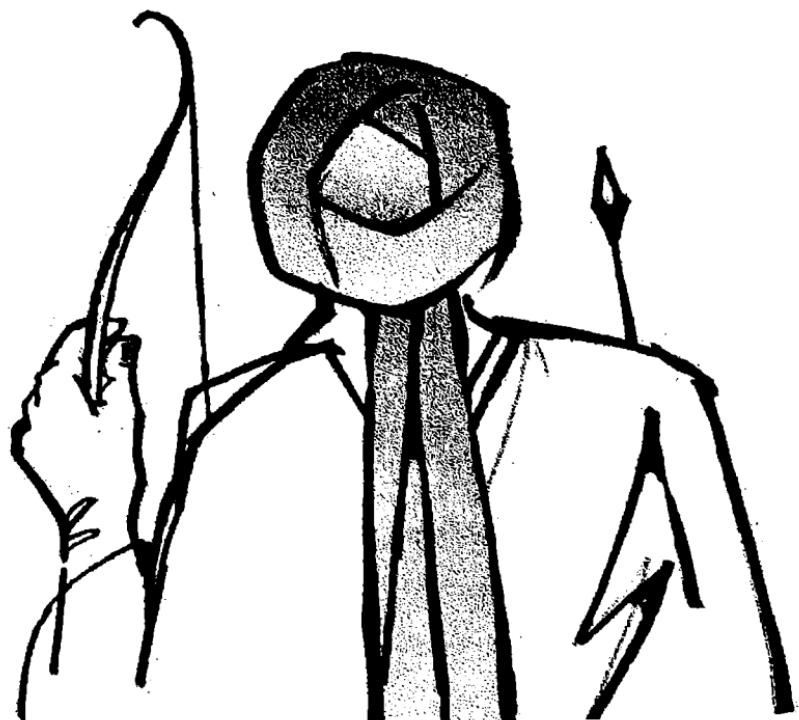
উঠে গেলেন টিলার ওপর।

তারপর তাকে জাফটে ধরলেন আচ্ছা করে।

দু'জনই টিলা থেকে গড়িয়ে পড়ছেন নিচে।

রাসূল (সা) দেখছেন সবই। বললেন, "এদের মধ্যে যে প্রথম ভূমিতে পড়বে, নিহত হবে সেই।"

কী আশ্চর্য!

www.icsbook.info

রাসূলের (সা) কথা শেষ হতেই ভূমিতে প্রথম পড়লো সেই মুশরিকটি। আর সাথে সাথেই তরবারির একটি মাত্র আঘাতে তার মস্তকটি দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন যুবাইর।

যুবাইর মুখোমুখি হলেন আর একজন মুশরিক– উবাইদা ইবন সাঈদের।

সে এমনভাবে বর্মাচ্ছাদিত ছিল যে তার চোখ দুটো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

কুশলী এবং সতর্ক যুবাইর।

তিনি উবাইদার চোখ নিশানা করে তীর ছুঁড়লেন।

অব্যর্থ নিশানা।

বিদ্যুৎগতিতে তীরটি বিঁধে গেল উবাইদার চোখে। এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে তীরটি গেঁথে আছে তার চোখের মধ্যে।

www.icsbook.info

যুবাইর ছুটে গেলেন উবাইদার কাছে। তারপর তার লাশের ওপর বসে তীরটি টেনে বের করে আনলেন।

তীরটি কিছুটা বেঁকে গেছে। সেই বাঁকা তীরটি রাসূল (সা) নিয়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে।

রাসূলের (সা) ইন্তেকালের পর খলিফাদের কাছেও রক্ষিত ছিল এই ঐতিহাসিক তীরটি।

হযরত উসমানের শাহাদাতের পর নিজের কাছেই আবার তীরটি নিয়ে নেন যুবাইর।

বদর যুদ্ধে তিনি জীবন বাজি রেখে এমনভাবে যুদ্ধ করেছিলেন যে ভোতা হয়ে গিয়েছিল তার তরবারিটি।

তিনিও আহত হয়েছিলেন মারাত্মকভাবে।

শরীরে একটি বিশাল গর্ত হয়ে গিয়েছিল।

তার ছেলে উরওয়া বলতেন, আমরা আব্বার শরীরের সেই গর্তে আঙ্গুল ঢুকিয়ে খেলা করতাম।

বদর যুদ্ধে যুবাইরের মাথায় ছিল হলুদ পাগড়ি।

রাসূল (সা) হেসে বলেছিলেন, 'আজ ফেরেশতারাও এ বেশে এসেছে।'

উহুদ যুদ্ধ।

সত্য এবং মিথ্যার যুদ্ধ।
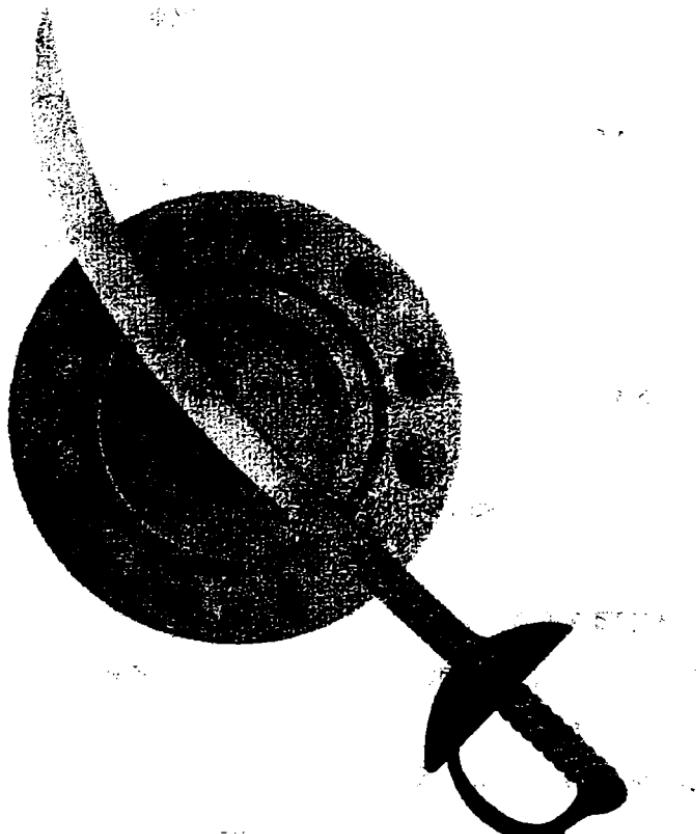
রাসূল (সা) কোষমুক্ত করলেন তার তরবারি। তারপর বললেন,

'আজ কে এই তরবারির হক আদায় করতে পারে?'

রাসূলের (সা) আহ্বানে সকল সাহাবীই অত্যন্ত আনন্দের সাথে চিৎকার করে বললেন, 'আমি! আমিই পারবো এই তরবারির হক আদায় করতে।'

সেখানে উপস্থিত ছিলেন যুবাইর। তিনি তিন তিন বার বললেন,

'হে রাসূল (সা)! আমাকে দিন। আমিই এই তরবারির হক আদায় করবো।'

www.icsbook.info

কিন্তু সেই সৌভাগ্য অর্জন করেন আর এক দুঃসাহসী সৈনিক-আবু দুজানা।

খন্দকের যুদ্ধেও ছিল যুবাইরের অসাধারণ ভূমিকা।

যুদ্ধের সময় মদীনার ইহুদি গোত্র বনু কোরাইজা ভঙ্গ করলো মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তি।

তাদের অবস্থান জানা দরকার রাসূলের (সা)। তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া জরুরি।

www.icsbook.info

কিন্তু কাজটা সহজ ছিল না।

রাসূল (সা) তাকালেন তার সাহাবীদের দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কে পারবে তাদের থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে আমাকে জানাতে?'

তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করলেন।

আর তিনবারই হাত উঁচু করে দাঁড়ালেন যুবাইর। বললেন,

'হে রাসূল! আমি, আমিই পারবো সেখানে যেতে এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে আপনার কাছে পৌঁছে দিতে। দয়া করে আমাকে অনুমতি দিন হে রাহমাতুল্লিল আলামীন!'

যুবাইরের কথায় ভীষণ খুশি হলেন রাসূল (সা)। তিনি বললেন, 'প্রত্যেক নবীরই থাকে হাওয়ারী। আমার হাওয়ারী হলো যুবাইর।'

হযরত যুবাইর!

তিনি ছিলেন রাসূলের (সা) হাওয়ারী এবং নিত্যসহচর।

সাহস, সততা, আমানতদারি, দয়া, কোমলতা- এসবই ছিল তার পোশাকের মত অনিবার্য ভূষণ।

আল্লাহ, রাসূল (সা) এবং ইসলামের প্রতি ছিল তার দৃষ্টান্তমূলক ভালোবাসা এবং আত্মত্যাগ।

সোনার মানুষ ছিলেন তিনি।

যে দশজন সাহাবীর বেহেশতের আগাম সুসংবাদ দিয়েছিলেন দয়ার নবীজী, যুবাইর ছিলেন তাদেরই একজন, অন্যতম।

হযরত যুবাইর!

কী অসাধারণ ছিল তার চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব!

এখনও যেন হাওয়ায় দুলছে তার সেই দুঃসাহসী মস্তকের হলুদ পাগড়ির দুর্বিনীত শিষ।■

www.icsbook.info

খলিফা হযরত উমর (রা)।

খলিফা হবার আগেও তিনি গরিব-দুঃখীদের খোঁজ-খবর নিতেন। তাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন।

গরিব-দুঃখীদের খবর নেবার জন্যে তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্যে হযরত উমর (রা) রাতের গভীর মহল্লায়-মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন। একাকী। ঘুরতে ঘুরতে একবার তিনি মদীনার একপ্রান্তে এসে পৌছুলেন।

www.icsbook.info

সেই এলাকার একপাশে থাকেন এক অসহায় বুড়ি। দারুণ দুঃখ-কষ্টে বুড়ির দিন কাটে।

হযরত উমর (রা) বুড়ির দুঃখের কথা জেনে বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাকে সাহায্য করার জন্য তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন। ভাবলেন, নিজের হাতেই তাকে সাহায্য করবেন।

পরদিন হযরত উমর (রা) একাকী চলে গেলেন বুড়ির বাড়িতে।

বুড়ির সাথে দেখা করলেন।

শুনলেন, কে একজন এসে তার কষ্ট দূর করে দিয়ে গেছেন।

অবাক হলেন হযরত উমর (রা)।

বড় আশ্চর্যের কথা!

কে সেই ব্যক্তি, যিনি উমরের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চান? সে কোন্ ব্যক্তি, যিনি মানুষের সেবায় উমরকে পরাজিত করেন!

তাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন হযরত উমর (রা)।

যে করেই হোক, তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।– ভাবলেন তিনি।

প্রতিদিনই তিনি লুকিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। চেষ্টা করেন সেই ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে।

এভাবে কেটে যায় সময়। কেটে যায় প্রহর। কিন্তু পান না তার প্রার্থিত সেই ব্যক্তিকে।

আর কত অপেক্ষা করতে হবে? তিনি ভাবেন।

এক রাতে লুকিয়ে আছেন হযরত উমর (রা)।

একটু পরেই তিনি দেখলেন, একজন ব্যক্তি এলেন বুড়ির বাড়িতে।

বুড়ির কাছে গিয়ে তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন।

বুড়ি খুশি হলেন।

খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন হযরত উমর (রা)।

www.icsbook.info

দেখলেন, যিনি বুড়ির দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তিনি আর কেউ নন– হযরত আবু বকর (রা)।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি সাক্ষাৎ হলে দু'জনই হেসে উঠলেন। সে এক মধুর হাসি।

উমর (রা) বললেন, আল্লাহর দরবারে হাজার শোকর যে, স্বয়ং খলিফা ছাড়া আমি আর কারো কাছে পরাজিত হইনি।

এই হলেন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)।

হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন রাসূলের (সা) সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম। জ্ঞানে-প্রজ্ঞায় বিদ্যা-বুদ্ধিতে তিনি ছিলেন অসাধারণ।

হযরত আবু বকর ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু এবং সহনশীল।

আর নম্রতা, ভদ্রতা এবং বিনয় ছিল তার একান্ত ভূষণ।

ইসলামপূর্ব সময়ে সেই জাহেলি যুগেও হযরত আবু বকর ছিলেন চরিত্র, ব্যবহার আর আচরণগত দিক থেকে অনুকরণীয়।

জাহেলি সমাজের কোনো কালিমাই তাকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি।

এ কারণে মক্কাবাসীরা তাকে শ্রদ্ধা করতো একান্ত হৃদয় থেকে।

আর বিশ্বাস করতো তাকে সর্বান্তকরণে।

কুরাইশদের মধ্যে তার মর্যাদা ছিল অনেক উচ্চে।

খুব ছোটকাল থেকে, সেই শৈশবকাল থেকেই আবু বকরের (রা) বন্ধুত্ব এবং গভীর সম্পর্ক ছিল রাসূলের (সা) সাথে।

বয়সের দিক থেকেও তারা ছিলেন প্রায় সমবয়সী। এক সাথে, একই পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছিলেন দু'জন। ব্যবসা, বাণিজ্যেও যেতেন একই সাথে।

একবার ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া যাচ্ছেন রাসূল (সা)।

তখন তাঁর বয়স বিশ বছর।

আর তাঁর সাথে আছেন বন্ধু আবু বকর। তার বয়স তখন আঠার।

www.icsbook.info

সিরিয়া সীমান্তে পৌঁছে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।

একটি গাছের নিচে বসে পড়লেন রাসূল (সা)।

তাঁর থেকে একটু দূরে গিয়ে এদিকে-ওদিক তাকিয়ে দেখছেন আবু বকর (রা)।

এমনি সময়ে তিনি দেখতে পেলেন একজন পাদ্রিকে। খ্রিস্টান পাদ্রির নাম– 'বুহাইরা' বা 'নাসতুরা'।

পাদ্রির সাথে বেশ কিছুক্ষণ কথা হলো আবু বকরের। না, অন্য কোনো প্রসঙ্গে নয়। তাদের আলাপ ছিল ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আলাপের এক ফাঁকে পাদ্রি জিজ্ঞেস করলেন, ঐখানে, ঐ গাছের নিচে বসে আছেন কে?

আবু বকর জবাব দিলেন, উনি মক্কার কুরাইশ গোত্রের মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ!

নামটি শুনেই পাদ্রি একটু থমকে গেলেন।

তারপর বললেন, ঐ ব্যক্তি আরবদের নবী হবেন।

পাদ্রির কথাটি শুনেই আনন্দের এক অপার্থিব ঢেউ খেলে গেল আবু বকরের মধ্যে। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো, হ্যাঁ– সত্যিই একদিন নবী হবেন আমার বন্ধু-মুহাম্মাদ।

পাদ্রির কথাটি মিথ্যা ছিল না।

এতটুকু ভুল ছিল না তার ধারণায়।

সত্যিই একদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াতের নিয়ামত পেলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা)।

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর যখনই রাসূল (সা) ইসলামের দাওয়াত দিলেন আবু বকরকে, আর সাথে সাথে তিনি তা কবুল করলেন।

রাসূলও (সা) বলতেন, 'আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, একমাত্র

www.icsbook.info

আবু বকর ছাড়া প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করেছি।'

হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন বয়স্ক আজাদ লোকদের মধ্যে প্রথম মুসলমান।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবু বকর নিজেকে উৎসর্গ করে দেন আল্লাহর পথে।

আল্লাহর দীনের পথে।

রাসূলের (সা) প্রদর্শিত পথে।

তাঁর যাবতীয় সম্পদ এবং শক্তি কুরবানী করে দেন আল্লাহর রাস্তায়। হাসিমুখে।

দয়ার নবীজী (সা) যখন প্রকাশ্যে নবুওয়াতের ঘোষণা দিলেন, হযরত আবু বকরের কাছে তখন ছিল চল্লিশ হাজার দিরহাম।

মুহূর্তেই তিনি তার এই বিপুল অর্থ ওয়াক্ফ করে দিলেন ইসলামের জন্য।

তার অর্থ দিয়েই দাসের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করে ইসলামের খেদমতে নিজেদেরকে উৎসর্গ করার সুযোগ পেয়েছিলেন হযরত বিলাল, খাব্বাব, আম্মার, আম্মারের মা সুমাইয়্যা, সুহাইব, আবু ফুকাইহাসহ আরও অনেক দাস-দাসী।

হযরত আবু বকরের দান সম্পর্কে রাসূল (সা) বলতেন :

'আমি প্রতিটি মানুষের ইহসান পরিশোধ করেছি। কিন্তু আবু বকরের ইহসানসমূহ এমন যে, তা পরিশোধ করতে আমি অক্ষম। তার প্রতিদান আল্লাহ দেবেন। তার অর্থ আমার উপকারে যেমন এসেছে, অন্য কারো অর্থ তেমন আসেনি।'

দয়ার নবীজীর মুখে মিরাজের কথা শুনে অনেকেই বিশ্বাস করতে দ্বিধান্বিত হন।

কিন্তু আবু বকর তা হননি।

তিনি রাসূলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন :

www.icsbook.info

'হে আল্লাহর নবী! আপনি কি জনগণকে বলেছেন যে, আপনি গতরাতে বাইতুল মাকদাস ভ্রমণ করেছেন?'

রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ।

রাসূলের মুখ থেকে একথা শুনার সাথে সাথেই তিনি বললেন,

'আপনি ঠিকই বলেছেন হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল।'

নবীজী (সা) বললেন :

'হে আবু বকর, তুমি সিদ্দীক।'

কী অপূর্ব পুরস্কার!

রাসূল (সা) হযরত আবু বকরের 'সিদ্দীক' উপাধিতে ভূষিত করলেন।

হযরত আবু বকর (রা) সারাটি জীবন রাসূলের (সা) সঙ্গী ছিলেন।

হিজরতের অনুমতি পাবার পর রাসূল (সা) সর্বপ্রথম গেলেন আবু বকরের বাড়িতে। তাকেই জানালেন সমস্ত ঘটনা। এবং কী আশ্চর্য! হযরত আবু বকরও রাসূলের (সা) সাথে হিজরত করার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

হযরত খাদিজার (রা) ইন্তেকালের পর বিমর্ষ হয়ে পড়লেন রাসূল (সা)।

এ সময়ে হযরত আবু বকর নিজের আদরের কন্যা হযরত আয়েশাকে (রা) বিয়ে দিলেন রাসূলের (সা) সাথে।

হিজরতের পর প্রতিটি অভিযানে হযরত আবু বকর ছিলেন মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী।

তাবুক যুদ্ধ!

তাবুক অভিযানে হযরত আবু বকর ছিলেন মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী।

এই অভিযানের সময় তিনি রাসূলের (সা) আবেদনে সাড়া দিয়ে তার সকল অর্থ রাসূলের (সা) হাতে তুলে দেন।

www.icsbook.info

অবাক হয়ে রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন,

'ছেলে-মেয়েদের জন্য কিছু রেখেছো কি?'

জবাবে আবু বকর (রা) বললেন,

'তাদের জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই যথেষ্ট'।

রাসূলের (সা) ওফাতের পর প্রথম খলিফা নির্বাচিত হলেন হযরত আবু বকর (রা)।

খলিফা নির্বাচিত হবার পর তিনি সমবেত মুহাজির ও আনসারদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দিলেন। সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন :

'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে খলিফা নির্বাচিত করা হয়েছে।

আল্লাহর কসম!

www.icsbook.info

আমি চাচ্ছিলাম আপনাদের মধ্য থেকে অন্য কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করুক।

আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনারা যদি চান আমার আচরণ রাসূলের (সা) আচরণের মত হোক, তাহলে আমাকে সেই পর্যায়ে পৌঁছার ব্যাপারে অক্ষম মনে করবেন। কারণ তিনি ছিলেন নবী। তিনি যাবতীয় ভুল-ত্রুটি থেকে পবিত্র ছিলেন। তাঁর মত আমার কোনো বিশেষ মর্যাদা নেই।

আমি একজন সাধারণ মানুষ। আপনাদের কোনো একজন সাধারণ ব্যক্তি থেকেও উত্তম হওয়ার দাবি আমি করতে পারি না।... আপনারা যদি দেখেন আমি সঠিক কাজ করছি, তবে আমাকে সহযোগিতা করবেন। আর যদি দেখেন আমি বিপথগামী হচ্ছি, তাহলে আমাকে সতর্ক করে দেবেন।'

হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন যেমনই কোমল, তেমনই আবার দৃঢ়। তার এই মহৎ চরিত্রের কারণে তিনি ছিলেন অনন্য।

রাসূলের (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বিরাজ করে। কিন্তু তার সবচেয়ে যে বড় অবদান তা হলো– পবিত্র আল কুরআনের সঙ্কলন ও সংরক্ষণ।

হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন যেমনই মর্যাদাবান, তেমনি সম্মানিত এক সাহাবী।

আল্লাহর রাসূল (সা) প্রতিদিন নিয়মিত যেতেন তার বাড়িতে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

রাসূলের (সা) বর্ণনায় এবং আর কুরআনেও হযরত আবু বকরের (রা) মর্যাদা সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

তার আত্মত্যাগ, তার ধৈর্য, সাহস, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা এবং হীরক সমান জ্ঞান– এসবই ইসলামের বিজয়ের জন্য কাজ করেছে বিপুলভাবে।

হযরত আবু বকর (রা)!

তার উপমা– নদী তো নয়, বিশাল সাগর।

সাগরের অধিক।

আমরা এখনো যেন শুনতে পাই সেই দূর সাগরের ডাক।■

www.icsbook.info

পরম পাওয়া

তখনও সূর্য ওঠেনি ইসলামের।

তখনও অন্ধকারে তলিয়ে মক্কা, মদীনাসহ গোটা পৃথিবী।

কিন্তু এই অন্ধকার আর কতকাল চলবে?

এর অবসান হওয়া চাই।

আল্লাহ বড়ই মেহেরবান।

www.icsbook.info

তিনি মানুষের মুক্তির যুগে যুগে, কালে কালে পাঠান তার এই প্রিয় পৃথিবীতে শান্তির বারতা নিয়ে আলোর মানুষ।

হযরত ঈসার (আ) পর তো বহুকাল গেটে গেল।

মানুষ তখন ভুলে বসে আছে তার দেখানো পথের কথা। আর জড়িয়ে পড়েছে হাজারো পাপের সাথে।

পাপে আর পাপে গোটা পৃথিবী কলুষিত হয়ে উঠেছে।

এই পাপ আর অন্ধকার দূর করার জন্যই মহান আল্লাহ পাঠালেন তার প্রিয় নবী মুহাম্মাদকে (সা)।

মক্কার একটি জীর্ণ কুটিরে সহসা বয়ে গেল আলোর বন্যা।

শুধুই কি মক্কায়?

না। গোটা পৃথিবীতেই পৌঁছে গেল এই খুশির বারতা।

হ্যাঁ। এসেছেন! এসেছেন আলোকের সেনাপতি সুন্দর ভুবনে।

এবার তো কেবল আলোর খেলা!

জোছনার ঝলকানি!

কেন নয়!

আল্লাহ পাকই তো প্রিয় রাসূলকে (সা) সেই আলোকোজ্জ্বল এক আশ্চর্য প্রদীপ হিসেবে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ পাক যে তার বান্দাকে বড় বেশি ভালোবাসেন। তিনিই তো বান্দার অতি আপন। একান্ত কাছের।

নবুওয়ত প্রাপ্তির পর রাসূল (সা) ব্যস্ত হয়ে পড়লেন শতগুণে।

ঝর্ণাধারার মত গড়িয়ে যায় তার প্রহরগুলো। আর বাতাসের বেগে ছুটে বেড়ান তিনি এক প্রান্তর থেকে অন্য প্রান্তরে।

একটিই উদ্দেশ্য তাঁর।–

কিসে হবে মানুষের মুক্তি।

কিসে আসবে শান্তি ও শৃঙ্খলা।

কিসে বইবে প্রতিটি মানুষের মনে আলোকিত বন্যা। কিসে!

www.icsbook.info

সেসব কেবল আল্লাহর দেয়া আল কুরআনেই মৌচাকের মধুর মত জমা হয়ে আছে।

আল কুরআন!

এই এক আশ্চর্য জাদুর মৌচাক।

সেখানে কেবল সমাধানের সুপেয় মধু আর মধু। যা কখনো নিঃশেষ হবার নয়।

মক্কায় তখন চলছে কুরআনের চর্চা। সেখানে সর্বত্র চলছে এর প্রচার ও প্রসারের কাজ।

ইসলামের একদল জানবাজ মুজাহিদ মৌমাছির মত মিশে আছেন রাসূলের (সা) সাথে।

যারাই আসেন সেদিকে, তারাই পথ পেয়ে যান।

কী সেই আলোকিত ঝলমল পথ!

কী সেই সুখ ও শান্তির পথ!

দুনিয়ার ধন-দৌলত আর রাজপ্রাসাদ অতি তুচ্ছ সেই সুখের কাছে।

সে যে আখিরাতের সওদা!

যেখানে কেবলই শান্তি আর শান্তি।

যারা সৌভাগ্যবান, তারা সমবেত হয়েছেন রাসূলের (সা) চারপাশে।

মক্কায় তখন চলছে আল কুরআনের চাষবাস।

জমিনটা খুব উর্বর নয়।

তবুও তো চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই রাসূলের (সা)। ক্লান্তি নেই তাঁর পরিশ্রমী মহান সাথীদেরও।

মদীনা তখনো অন্ধকারে তলিয়ে আছে।

সেখানে তখনো পৌঁছেনি নবীর (সা) কোনো আলোক ধারা।

সেখানকার মানুষ আগের মতই রয়ে গেছে তুমুল অন্ধকারে।

ব্যক্তিগত-ব্যক্তিতে ঝগড়া-বিবাদ। গোত্রে-গোত্রে কেবল মারামারি আর অশান্তি।

www.icsbook.info

সামান্য বিরোধ নিয়েও ঘটে যায় তুমুল কাণ্ড। রক্তারক্তি।

মদীনা তখনো অশান্তির সাগরে কেবলি হাবুডুবু খাচ্ছে।

তারা সেই দুঃসহ যাতনা থেকে মুক্তি চায়। মুক্তি চায় যাবতীয় অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা থেকে।

কিন্তু কিভাবে?

সেটা তখনো তারা জেনে-বুঝে উঠতে পারেনি।

ঠিক এমনি এক সময়।–

মদীনার আসয়াদ ইবন যুরারা এবং জাকওয়ান ইবন আরবদিল কায়স তাদের একটি ঝগড়ার মীমাংসার জন্য এলেন মক্কায়।

তাদের বিবাদ মীমাংসা করবেন মক্কার কুরাইশ গোত্রের বিখ্যাত নেতা উতবা ইবন রাবী'য়া।

উতবার কাছে তারা তাদের সমস্যার কথা বিশদভাবে বললেন।

তাদের কথা শুনে উতবা তাদের জন্য একটি মীমাংসার পথও বাতলে দিলেন।

কিন্তু বিষয় সেটা নয়।–

রহস্যটা লুকিয়ে আছে অন্যখানে।

কথায় কথায় উতবার কাছেই শুনলেন তারা মুহাম্মাদের (সা) কথা। শুনলেন আল কুরআনের কথা।

শুনার পর থেকেই তাদের মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠলো বিষয়টি সম্পর্কে আরো জানার জন্য।

মক্কায় তখনো প্রকাশ্যে ইসলামের কাজ চালানো সম্ভব হয়নি।

চলছে গোপনে গোপনে।

আল কুরআনের বাণীও মানুষের কাছে পৌঁছানো হচ্ছে সেইভাবে। সন্তর্পণে। রাস্তাঘাটে, হাটে-বাজারে-সর্বত্রই চলছে দাওয়াতের এমনি গোপন মিশন।

www.icsbook.info

আসয়াদ এবং জাকওয়ান।

দু'জনই বুদ্ধিমান।

তারা গোপনে চলে গেলেন দয়ার নবীজী মুহাম্মাদের (সা) কাছে।

অতি গোপনে।

মক্কার দুষ্ট লোকদের সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল পূর্ব থেকেই।

তারা জানতেন এই সকল দুষ্ট লোকদের নির্মমতার খবর। এইজন্যই তারা গোপনীয়তার আশ্রয় নিলেন।

আসয়াদ এবং জাকওয়ানকে কাছে পেয়ে খুবই খুশি হলেন দয়ার নবীজী (সা)।

একে তো তারা নতুন, যারা আসছেন আলোর পথে। আবার তারা ভিন্ন শহরের, মদীনার মানুষ।

সুতরাং খুশির কথাই বটে।

কারণ এখন থেকে মক্কার বাইরে- মদীনায়ও আল কুরআনের প্রচার-প্রসারের কাজ চলবে। আল্লাহর রহমত এবং বরকত তো এইভাবেই আসে। অপ্রত্যাশিতভাবে হয়তো বা পাওয়া যায় তাঁর সেই করুণার বৃষ্টি।

আসয়াদ এবং জাকওয়ান রাসূলের (সা) কাছ থেকে আল কুরআনের কিছু অংশ শুনলেন। তাদের ভীষণ ভালো লাগলো। বুঝলেন, আরে! এই তো সেইপথ- যে পথের সন্ধানে আমরা ঘুরেছি সারাটি জীবন যাযাবরের মত। তবে আর দেরি কেন!

না, দেরি নয়। মুহূর্তেই তারা দু'জনই রাসূলের (সা) কাছে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এবং তারপর-

তারপর তারা উতবার কাছে আর না গিয়ে ফিরে গেলেন আপন জন্মভূমি মদীনায়।

তাদের মনটা তখন ঢেউ টলোমল পদ্মদীঘি।

বৃষ্টি ধোয়া বালুর উঠোন।

www.icsbook.info

পুকুর পাড়ের সবুজ চাতাল।

কী যে প্রশান্তি!

কী যে আরাম!

এক অপার্থিব ফুরফুরে বেহেশতি হাওয়া বয়ে যাচ্ছে তাদের হৃদয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

তারা তখন ভীষণভাবে উজ্জীবিত এবং উদ্বেলিত।

মদীনায় ফিরে দু'জনই লেগে গেলেন ইসলামের খেদমতে।

আল কুরআনের প্রচার প্রসারই তাদের তখন প্রধান কাজ।

রাসূলের বাণী অন্যের কাছে তুলে ধরাই তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

সুতরাং আর নয় মারামারি। আর নয় হানাহানি। এবার চির শান্তি ও কল্যাণের পথে কেবলই হাঁটার পালা।

হাঁটছেন আসয়াদ। হাঁটছেন জাকওয়ান।

www.icsbook.info

হাঁটছেন আল্লাহর পথে।

আল কুরআনের পথে।

রাসূলের (সা) নির্দেশিত পথে।

ফলে তাদের আর শঙ্কা কিসের?

কিসের আর ভয়?

মদীনা।

চমৎকার একটি শহর।

ইসলামরে জন্যও একটি প্রশস্ত উর্বর ক্ষেত্র। কী সৌভাগ্যবান এই দু'জন। তারাই প্রথমে মদীনায় ইসলাম প্রচারের সৌভাগ্য অর্জন করলেন!

এই দু'জনের মধ্যে আসয়াদের (রা) সৌভাগ্যের বিষয়টি আর একটু ভিন্ন।

হযরত আসয়াদ মদীনায় ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। সেই সাথে তিনি নামাযের ইমামতিও করে যাচ্ছেন প্রতিটি দিন।

যতদিন না রাসূল (সা) মুসায়বকে (রা) মদীনায় দীন প্রচারের জন্য প্রশিক্ষক হিসেবে পাঠালেন, ততোদিনই মদীনার প্রতিটি নামাযের ইমামতি করেছেন আসয়াদ।

কী সৌভাগ্যবান তিনি!

মুসয়াবকে কাছে পেয়ে আনন্দে বাগবাগ হয়ে উঠলেন আসয়াদ।

এবার মুসয়াবের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দু'জনে দীনের দাওয়াতের কাজ আরো বেগবান করে তুললেন।

তার মনের স্পৃহা এবং শক্তিও বেড়ে গেল বহুগুণে।

আসয়াদ এবং মুসয়াবের সম্মিলিত দাওয়াতের ফলে মাত্র এক বছর পর নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে হজের মৌসুমে তিয়াত্তর, মতান্তরে পঁচাত্তর জন নারী-পুরুষ মদীনা থেকে এলেন।

ইসলামের এই বিশাল বাহিনীটি মিনার আকাবায়ে গোপনে মিলিত হন দয়ার নবীজীর (সা) সাথে।

www.icsbook.info

তৃতীয় এবং সর্বশেষ এই আকাবায় শামিল ছিলেন আসয়াদও।

এই আকাবায় রাসূলের (সা) হাতে হাত রেখে সর্বপ্রথম যিনি বাইয়াত বা শপথ গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন, তিনিই হযরত আসয়াদ।

বাইয়াতের পর রাসূল (সা) মদীনায় দীনি দাওয়াতের জন্য নকীব বা দায়িত্বশীল নির্বাচন করলেন।

রাসূলের (সা) সেই নির্বাচিত প্রথম নকীব হলেন হযরত আসয়াদ।

মাঝখানে কালের পিঠে গড়িয়ে গের বেশ কিছুটা কাল।

নবী (সা) যাচ্ছেন মদীনায়।

মদীনার আকাশে-বাতাসে ভেসে যাচ্ছে খুশির কলধ্বনি।

ঘরে ঘরে আনন্দের ঢেউ।

সবাই অপেক্ষায় আছেন রাসূলের (সা) আগমনের দিকে। সবাই পিপাসিত দয়ার নবীজীকে (সা) স্বাগত জানানোর জন্য।

রাসূল (সা) এলেন মদীনায়।

মুহূর্তেই মুখরিত হয়ে উঠলো গোটা মদীনা।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্যখানে।

সেটা হলো, কে হবেন সেই সৌভাগ্যবান! যিনি নবীজীকে (সা) নিতে পারবেন তার বাসগৃহে?

এ নিয়ে দেখা দিল তাদের মধ্যে এক আশ্চর্য প্রতিযোগিতা।
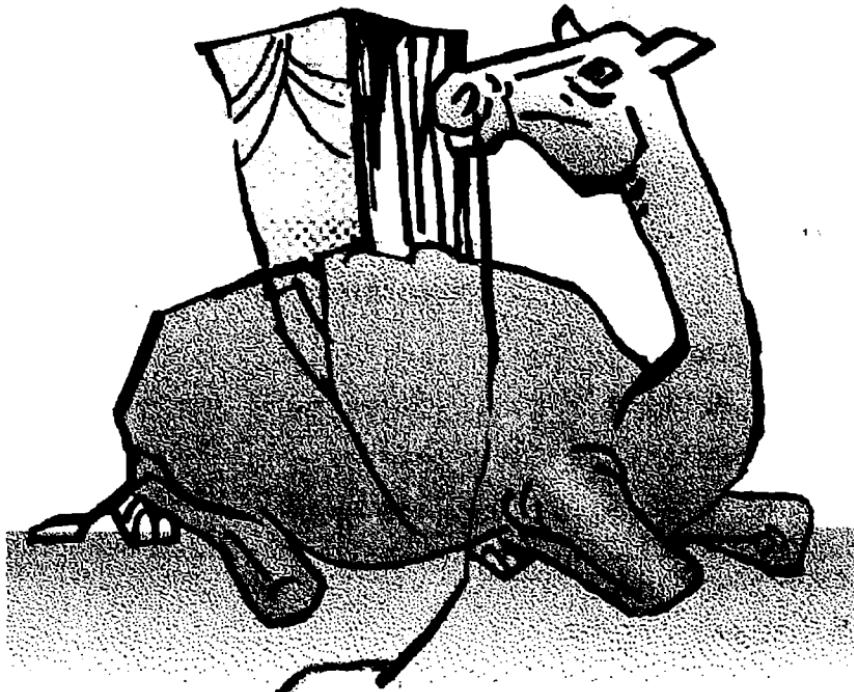
অবশেষে মীমাংসা হলো একটি শর্তে। রাসূলের (সা) বাহন যার বাড়িতে এসে থামবে, তিনিই হবেন রাসূলকে (সা) বাড়িতে নেবার জন্য উপযুক্ত।

সুতরাং এ নিয়ে আর বাড়াবাড়ি নয়। থেমে গেল প্রতিযোগিতার পালা।

কিন্তু থামে না উৎকণ্ঠার মরুঝড়।

সেটা বয়ে চলেছে মদীনার প্রতিটি নবীপ্রিয় মুমিনের হৃদয়েই।

অবশেষে থেমে গেল রাসূলের (সা) বাহন। আবু আইউব আল আনসারীর বাড়ির সামনে।

www.icsbook.info

ফলে আবু আইউবই হয়ে গেলেন রাসূলকে (সা) বাড়িতে নেবার সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি!

কিন্তু আসয়াদ!

তিনি তো কম সৌভাগ্যবান নন।

রাসূলকে (সা) তার বাড়িতে নেবার সৌভাগ্য হলো না ঠিকই, কিন্তু সেই বেদনার কুয়া কিছুটা পূর্ণ হলো খুশির বৃষ্টিতে। কারণ রাসূল (সা) আছেন আবু আইউবের বাড়িতে। আর রাসূলের (সা) প্রিয় বাহন- উটনীটির দায়িত্বভার রয়ে গেল আসয়াদের ওপর।

www.icsbook.info

হোক না উটনী!

তবু তো রাসূলের (সা) বাহন! সুতরাং এই মেহমানও তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান। মর্যাদার দিক থেকেও তো যথেষ্ট। আসয়াদ তার এই সৌভাগ্যে খুশি হলেন এবং আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলেন।

হযরত আসয়াদ!

মক্কায় এসেছিলেন একটা ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য।

আর মক্কা থেকে ফিরে গেলেন জীবনের মীমাংসা বুকে চেপে।

এবং কী আশ্চর্য!

বাকি সারাটি জীবনই তিনি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য খেদমত করে গেছেন ইসলামের। সেই সাথে রাসূলের (সা)।

এটাই ছিল আসয়াদের (রা) জীবনে পরম পাওয়া।

হযরত আসয়াদ!

তিনি আল্লাহকে পেয়েছেন।

আলোকিত জীবনের জন্য দীনকে পেয়েছেন। পেয়েছেন প্রাণপ্রিয় রাসূলের (সা) সান্নিধ্য, ভালোবাসা এবং অশেষ দোয়া।

তার মত সৌভাগ্যের পরশে ধন্য হতে কার না ইচ্ছা জাগে?

নিজের জীবনকে আল্লাহর কাছে সোর্পদ করে দিলে, আর রাসূলকে (সা) চরম ও পরমপ্রিয় করে নিতে পারলেই আমরাও অর্জন করতে পারি ঝলমলে সোনালি সৌভাগ্য।

সেটাই তো হওয়া উচিত আমাদের চাওয়া-পাওয়ার একমাত্র মূল উৎসধারা।■

www.icsbook.info

তুমুল তুফান

রাসূল (সা) চলেছেন বদরের দিকে।

সাথে আছেন তাঁর একদল সাহসী যোদ্ধা।

যারা একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া ভয় করেন না অন্য কারো।

যাদের বুকে নেই শঙ্কার লেশ মাত্র।

যাদের চোখে নেই কোনো রকম জড়তার ছায়া।

www.icsbook.info

পার্থিব কোনো স্বার্থ নয়, একমাত্র আল্লাহকে রাজি-খুশির জন্যই তারা চলেছেন প্রাণপ্রিয় রাসূলের (সা) সাথে।

বদর যুদ্ধে।

রাসূলও (সা) মাঝে মাঝে পাঠ করছেন প্রত্যেকটি আলোর আবাবিলকে।

পাঠ করছেন আর পুলকিত হচ্ছেন।

খুশির দীপ্তিরা ঝরে ঝরে পড়ছে তাঁর জ্যোতির্ময়ী চেহারা দিয়ে।

মরুভূমির উত্তপ্ত বালি, লুহাওয়া, সূর্যের প্রখর তেজ- এসবই কেমন বাধ্য হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে গেল রাসূলের (সা) চলার পথে।

কষ্ট নয়, যন্ত্রণা নয়, বরং এক ধরনের আরামদায়ক আবহাওয়াই যেন দোল দিয়ে যাচ্ছে তাঁদের মাথার ওপর। সাথীদের নিয়ে রাসূল (সা) এগিয়ে চলেছেন।

রাসূল!- মহান সেনাপতি!

তিনি চলছেন আর দেখছেন চারপাশ।

দেখছেন আর ভাবছেন।

ভাবছেন- কোথায়, কোথায় শিবির স্থাপন করা যায়। কোন্ জায়গাটি সবচেয়ে উত্তম?

স্থান নির্বাচনে তিনি বেশ ব্যস্ত।

মগ্ন আছেন দয়ার নবীজী (সা)।

হঠাৎ শোনা গেল মহান সেনাপতির আওয়াজ, থাম!

সেনাপতির নির্দেশ!

সবাই থেমে গেলেন।

বদরের কাছাকাছি।

সাহাবীরা চারপাশে তাকালেন। ভালো করে দেখে নিলেন জায়গাটি।

তারাও ভাবতে থাকলেন, এখানে শিবির স্থাপন করলে কেমন হবে?

www.icsbook.info

সাহাবীরা কিছুটা চিন্তাক্লিষ্ট। এখানে শিবির স্থাপনের সুবিধা-অসুবিধা দুটো দিক নিয়েই তারা ভাবছেন।

তাদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ। নাম হুবাব ইবনুল মুনজির। পায়ে পায়ে তিনি এগিয়ে গেলেন রাসূলের (সা) কাছে।

তার চোখে-মুখে শ্রদ্ধা এবং বিনয়ের নরম কুয়াশা।

কণ্ঠে সুমিষ্ট আবে জমজম।

বিনীত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, হে দয়ার নবীজী! এখানে শিবির স্থাপনের সিদ্ধান্ত কি আল্লাহর পক্ষ থেকে, নাকি আপনার নিজের?

হুবাব! রাসূলের (সা) এক সুপ্রিয় সাহাবী।

তার জিজ্ঞাসায় বিরক্ত হলেন না মহান সেনাপতি রাসূল মুহাম্মাদ (সা)।

স্পষ্ট জিজ্ঞাসায় তাঁর চোখে জ্বলে উঠলো না কোনো ক্রোধের ফুলকি।

বিস্ময়ের কোনো মেঘও ছিল না তাঁর সাহসী ঠোঁটে।

হুবাবের জিজ্ঞাসায় একটু হাসলেন দয়ার নবীজী (সা)।

তারপর বললেন, না। এখানে শিবির স্থাপনের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোনো নির্দেশ দেননি। বরং আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

রাসূলের (সা) জবাব শুনে হুবাব আবারও বিনয়ের সাথে বললেন, হে প্রাণীপ্রিয় রাসূল! তাহলে এখানে নয়। এখানে শিবির স্থাপন করা আমাদের জন্য ভালো হবে না। চলুন না অন্য কোথাও।

অন্য কোথাও? সেটা কোথায়?

রাসূলের (সা) কণ্ঠে জিজ্ঞাসার বৃষ্টি।

হুবাব বললেন, 'হ্যাঁ। আমাদেরকে নিয়ে চলুন শত্রুপক্ষের কাছাকাছি। যেখানে আছে সর্বশেষ পানির ঠিকানা। সেখানে আমরা নিজেরাই তৈরি করে নেব পানির হাউজ। সেই হাউজটি ভরে রাখবো পানিতে। পাত্র দিয়ে পানি উঠিয়ে আমরা পান করবো। সেই সাথে প্রাণপণে করে যাব শত্রুদের সাথে যুদ্ধ। অপর দিকে অন্যান্য সকল কূপের পানি আমরা ঘোলা করে

www.icsbook.info

দেব। আমরা হচ্ছি যোদ্ধা সম্প্রদায়। যুদ্ধের কলাকৌশলও আমাদের জানা।'

অবাক হয়ে সবাই শুনছেন হুবাবের কথা।

তারপর? তারপর?— সবাই শুনতে চান তার কথা।

হুবাব আবার তার পরিকল্পনার কথা বলতে শুরু করলেন ঃ 'হ্যাঁ এভাবে, এভাবে আমরা আমাদের কূপ থেকে পানি তুলে পান করবো আর যুদ্ধ করবো। আর অপর দিকে অন্য সকল কুপের পানি ঘোলা হবার কারণে শত্রুরা তা ব্যবহার করতে পারবে না। যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে ছুটে যাবে পানির কাছে, তখন তারা পান করার মত কোনো পানিই কাছে পাবে না। পানি না পেয়ে তারা দিশেহারা হয়ে পড়বে। ক্রমান্বয়ে তাবৎ ক্লান্তি, হতাশা আর বিষণ্নতায় তারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। আর এভাবেই এক সময় তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পিঠটান দিতে বাধ্য হবে।'

হুবাবের যুক্তিপূর্ণ পরামর্শ।

সবাই তাকিয়ে আছেন মহান সেনাপতি রাসূলের (সা) দিকে।

তিনিও ভাবছেন। ভাবছেন বিষয়টি নিয়ে।

ঠিক এমনি সময়ে।—

এমননি সময় নেমে এলেন হযরত জিবরাইল। রাসূলের (সা) কাছে এসে তিনি জানালেন, 'হ্যাঁ। ঠিকই আছে হুবাবের পরামর্শ।'

আর কোনো সংশয় নয়।

এবার রাসূল (সা) হুবাবকে ডেকে বললেন, 'তোমার পরামর্শ ও মতটিই সঠিক। চলো, তেমনি একটি জায়গায় শিবির স্থাপন করি।'

রাসূল (সা) তাঁর সমগ্র বাহিনী নিয়ে এবার বদরের কুয়ার ধারে শিবির স্থাপন করলেন।

বদর!

বদর যুদ্ধে হুবাবের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন দয়ার নবীজী।

www.icsbook.info

শুধু বদর নয়, এমনি আরও অনেকবার তার সুচিন্তিত মতামত গৃহীত হয়েছিল রাসূলের (সা) কাছে।

মদীনার ইহুদি গোত্র বনু কুরায়জা ও বনু নাদীরের বিষয়ে সাহাবীদের কাছে রাসূল (সা) পরামর্শ চাইলেন।

হুবাব বলেন, 'হে রাসূল! আমরা তাদের ঘর-বাড়ি ঘেরাও করে তাদের যাবতীয় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেরবো।'

দয়ার নবীজী (সা) হুবাবের পরামর্শই গ্রহণ করলেন।

যুদ্ধের ময়দানেও হুবাব ছিলেন বিচক্ষণ এবং সাহসী।

ছিলেন তিনি বারুদস্ফুলিঙ্গ।

বদরের প্রান্তর।

যুদ্ধ চলছে ভীষণ বেগে।

হুবাব দেখলেন আবু কায়সকে।

নরাধম আবু কায়স!

যে মক্কায় দয়ার নবীকে (সা) নিদারুণ কষ্ট দিয়েছিল। তার উৎপীড়ন আর অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে কোনো হিংস্র পশুকেও।

সেই আবু কায়স এসেছে যুদ্ধ করতে শত্রুপক্ষে।

হুবাব দেখলেন তাকে।

তারপর ছুটে গেলেন তার দিকে। এবং তাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিলেন হুবাব।

এরপর নাগালে পেয়ে গেলেন তিনি আলীর (রা) উৎপীড়ক উমাইয়্যা ইবন খালফকে। তিনি তরবারির আঘাতে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন তার একটি উরু।

এভাবে তিনি আম্মার ইবন ইয়াসিরের সহযোগিতায় হত্যা করলেন উমাইয়্যার ছেলে আলীকেও। আর বন্দী করলেন খালিদ ইবন আল আলামকে।

www.icsbook.info

উহুদ যুদ্ধ!

ও প্রান্ত থেকে ধেয়ে আসছে কুরাইশ বাহিনী।

ভীষণ শোরগোল পড়ে গেল গোটা মদীনায়।

মদীনার অনতিদূরে জুলহুলায়দায় কুরাইশ বাহিনী পৌঁছলে, রাসূল (সা) দু'জন গুপ্তচরকে পাঠালেন সেখানে। তাদের খবরাখবর নেবার জন্য।

তাদের পেছনে আবার পাঠালেন হুবাবকেও।

হুবাব সেখানে গিয়ে তাদের সৈন্যসংখ্যা, প্রস্তুতিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে রাসূলকে প্রদান করেন।

উহুদ যুদ্ধের একটি ভয়াবহ পর্যায়ে, যখন মুসলিম বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, তখন যে পনেরজন সাহাবী নিজেদেরকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে দয়ার নবীকে (সা) ঘিরে রাখেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দুঃসাহসী হযরত হুবাব।

শুধু যুদ্ধের ময়দানেই নয়।

হুবাব ঢালস্বরূপ কাজ করেছেন সারাটি জীবন ইসলামের জন্য।

তিনি নিজেকে, নিজের যাবতীয় যোগ্যতাকে, নিজের তাবৎ সামর্থ্যকে কুরবানী করে দিয়েছিলেন আল্লাহর পথে। রাসূলকে (সা) ভালোবাসার সর্বোচ্চ নজরানা পেশ করতে তিনি ছিলেন কুণ্ঠাহীন।

হুবাব ছিলেন যেমনি সাহসী যোদ্ধা আবার তেমনি ছিলেন একজন কবি ও সুবক্তা।

নানাবিধ যোগ্যতায় তিনি ছিলেন পূর্ণ।

ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আর ত্যাগ, কুরবানী ও সাহসের দিক থেকে তিনি ছিলেন এক তুমুল তুফান।■

www.icsbook.info

তখন আরবের চারদিকে অন্ধকার।

থক থক করছে আঁধারের কাদামাটি।

কোথাও কোনো আলোর চিহ্ন নেই।

নেই এতটুকু সত্যের বাতি।

একেই বলে জাহেলিয়াত যুগ!

আরব মানেই তখন ভয়ঙ্কর এক জনপদ!

www.icsbook.info

যেখানে মিথ্যা, কুসংস্কার আর ক্ষমতার দাপট।

মানুষ মানেই একেকটি চকচকে তলোয়ার। কিংবা হিংস্র বন্যপ্রাণী।

আতঙ্কিত দুর্বল মানুষ।

তারা অপেক্ষায় প্রহর গোনে। কখন শেষ হবে এই নারকীয় পরিবেশের? কখন?

এক সময় শেষ হয় তাদের প্রতীক্ষার পালা।

মহান আল্লাহ তো দয়ার সাগর। তিনি মানুষের কল্যাণ চান। তিনিই মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

আল্লাহ পাক মিথ্যার কুহক থেকে পরিত্রাণের জন্য পাঠালেন দয়ার নবীজী মুহাম্মাদ (সা)।

মুহাম্মাদ (সা)!

মানুষ সৃষ্টির সেরা।

আর মানুষের ভেতর সেরা মানুষ নবী মুহাম্মাদ (সা)

যখন নবী এলেন দুনিয়ায়, তখন বদলে গেল পৃথিবীর চেহারা।

আর যখন তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হলেন, তখন তা চারদিকে বয়ে গেল পূর্ণিমা চাঁদের এক অসীম জোয়ার।

কেমন ঝকঝকা।

কেমন ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর।

তিনি দু'হাত তুলে ডাকেন মানুষকে আল্লাহর দিকে।

ইসলামের পথে।

রাসূলের (সা) দিকে।

শুধুই কি ডাকেন?

তিনি বুঝান সত্য আর মিথ্যার প্রভেদ।

ভালো আর মন্দের ফারাক।

বুঝান পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়-আশয়।

www.icsbook.info

যারা বুদ্ধিমান– তারা ভাবেন, আর তবে দেরি কেন? এই তো সময় বটে সত্যকে গ্রহণ করে পুরস্কার লাভের।

যারা সৌভাগ্যবান, তারা একে একে ছুটে আসেন।

ছুটে আসেন মিথ্যার মায়াজাল ছিন্ন করে আলোর পথে।

সত্যের পথে।

তারা পিপাসিত!

তারা তৃষ্ণার্ত!

কিসের পিপাসা?

পানি নয়। শরবত নয়। – সে এক অন্য পিপাসা।

সেই পিপাসা মেটাতে পারে একমাত্র ইসলামের আবে কাওসার।

ইসলাম!

কী এক ঝলমলে স্বপ্নপুরী!

ইসলাম গ্রহণ মানেই তো আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা।

নবীকে (সা) নিবিড়ভাবে পাওয়া।

তাঁর ভালোবাসার পরশে ধন্য হওয়া।

আর?

আর জোছনার বৃষ্টিতে অবিরত গোসল করা।

কী সৌভাগ্যের ব্যাপার!

যারা হতভাগা, তাদের কথা আলাদা।

কিন্তু যারা বুদ্ধিমান, তারা তো এমন সুযোগ হাতছাড়া করতেই চাইবে না।

হলোও তাই।

রাসূল (সা) যখনই ডাক দিলেন ইসলামের পথে, সত্য গ্রহণের। তখনই সাড়া দিলেন একে একে অনেক ভাগ্যবান আলোর মানুষ।

তখনও ইসলামের প্রথম যুগ।

www.icsbook.info

প্রাথমিক ধাপ টপকে যাবার প্রচেষ্টায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন রাসূলের (সা) সাথে অনেকেই।

দীনের দাওয়াত এগিয়ে চলেছে শ্যাওলা জমা পাপের নদী কেটে কেটে। ক্রমশ।

যতদূর সত্যের নৌকা যায়, ততদূরই চকচকে স্বচ্ছ পানি।

জীবন বাজি রেখে ক্রমাগত সামনে এগিয়ে চলেছেন রাসূলের (সা) সাথে কতিপয় সত্যের সৈনিক।

লক্ষ্য তাদের আলোকিত মঞ্জিল।

এই কাতারে একদিন শামিল হলেন টগবগে এক তরুণ।

চোখ তার প্রোজ্জ্বল।

বুকে তার সাহসের ঢেউ।

স্বপ্নের তুফানে দোল খায় অষ্টপ্রহর।

কারণ তিনি আছেন আল্লাহর পথে।

রাসূলের (সা) বাহুডোরে।

ইসলামের ছায়াবৃক্ষের নিচে।

তার আর কিসের পরওয়া?

কিসের ভয়!

ভয় নয়। শঙ্কা নয়।–

বরং এক ধরনের শীতলতা ও প্রসন্নতায় তিনি আচ্ছন্ন। তিনি সকল পাপ আর তাপ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করলেন।

কেন করবেন না?

স্বয়ং আল্লাহ পাকই যে তার জিম্মাদার। আর রাসূল (সা) তার প্রিয়সাথী, বন্ধু-স্বজন। একান্ত আপন।

তরুণ একা নন।

www.icsbook.info

সাথে তার স্নেহময়ী আম্মাও ইসলাম কবুল করলেন।

ফলে তার মনের শক্তি আরো বেড়ে গেল শতগুণে।

তিনি এখন প্রশান্ত মনে ইসলামের খেদমত করে যান।

দুনিয়ার যে কোনো শক্তিই তার কাছে এখন তুচ্ছ।

সকল বাধা আর বিপদই তার কাছে কেবল ঢেউয়ের বুদবুদ।

এই অসীম সাহসী তরুণের নাম– শাম্মাস।

আর তার সৌভাগ্যবতী আম্মা হলেন– হযরত সাফিয়্যা।

মা এবং পুত্র– দু'জনই প্রথম দিকে ইসলাম কবুল করে নিজেদেরকে আলোকিত করার সৌভাগ্য অর্জন করলেন।

নামটা রেখেছিলেন তার মামা।

www.icsbook.info

হযরত শাম্মাস!

জাহেলি যুগে একবার মক্কায় একজন খ্রিস্টান এলো। লোকটি দেখতে খুবই সুন্দর।

মুহূর্তের সাড়া পড়ে গেল মক্কায়।

সবাই বলাবলি করতে লাগলো, এমন সুন্দর চেহারার মানুষ তারা আর কখনো দেখেনি। একেবারে সূর্যের আলোর মত। তার চেহারা দিয়ে যেন সূর্যের কিরণ চমকায়।

কথাটি শুনেই মামার ভেতর এক ধরনের জিদ এসে গেল।

এরা বলে কী? আমার ভাগ্নেই বা এই লোকটি থেকে কম কিসে? সে তো এর চেয়েও সুন্দর।

এক ধরনের প্রতিযোগিতাসুলভ জিদ থেকেই মামা তার ভাগ্নেকে উপস্থাপন করলেন তাদের সামনে। বললেন,

'দেখ! দেখ, আমার প্রিয় ভাগ্নেটি কত সুন্দর! এই লোকটির থেকেও বেশি সুন্দর!'

তো সেই থেকেই এই ভাগ্নের নাম হয়ে গেল 'শাম্মাস'। এর অর্থ অতিরিক্ত সূর্যকিরণ বিচ্ছুরণকারী।

প্রকৃত অর্থেই শাম্মাস ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন এক যুবক।

দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। ভরে যায় হৃদয়ের চাতাল।

আর ইসলাম কবুলের পরে তো তিনিও হয়ে গেলেন পূর্ণিমাপ্লাবিত এক মহাসাগরের ঢেউ।
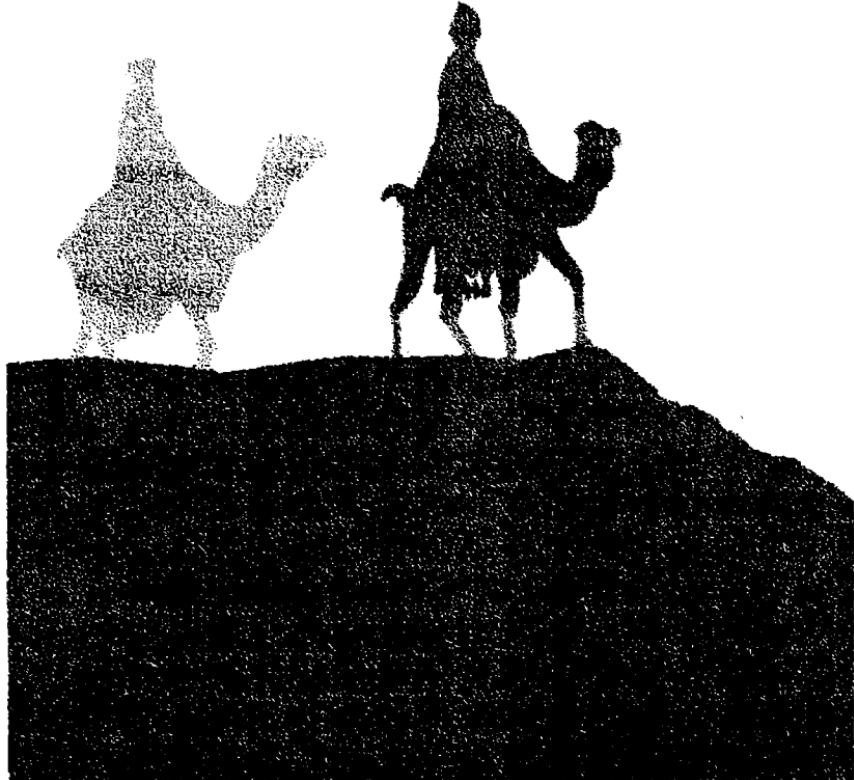
কিন্তু সত্য গ্রহণ করলে যা হয়।

তখন তো গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায় কাফেরদের।

আর তখন তারা শুরু করে নির্যাতনের সকল প্রকার পন্থা।

মুসলমানদের ওপর তখন ঝরছে নির্যাতন আর নিপীড়নের অগ্নিবৃষ্টি।

নির্যাতিত এই সকল সাথীকে রাসূল (সা) নির্দেশ দিলেন হিজরাতের।

www.icsbook.info

শাম্মাসও হিজরাত করলেন মদীনায়। সঙ্গে আছেন আম্মা সাফিয়্যাও।

জন্মভূমি ছেড়ে যাচ্ছেন তারা।

কিন্তু তাদের মধ্যে নেই বেদনার এতটুকু লেশ।

নেই বিন্দুমাত্র দুঃখ, কষ্ট কিংবা ক্ষোভ।

বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টির কোমল বৃষ্টিতে তারা স্নাত এবং পুলকিত।

শাম্মাস ছিলেন খুবই সাহসী। আর তেমনই জানা ছিল তার যুদ্ধের সকল প্রকার কলাকৌশল।

এলো বদরের যুদ্ধ।

www.icsbook.info

শাম্মাস অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দিলেন এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে।

তারপর এলো উহুদ যুদ্ধ।

এই যুদ্ধেও অসীম সাহসের সাথে লড়লেন শাম্মাস।

কিন্তু এক সময় মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিপর্যয় দেখা দিলে উহুদ প্রান্তর হয়ে পড়লো প্রায় অরক্ষিত।

তখন রাসূলের (সা) চারপাশ ঘিরে যারা ঢালের ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে দুঃসাহসী শাম্মাস ছিলেন অন্যতম।

কোনো দ্বিধা বা সংকোচও নয়।

বরং কী এক কঠিন প্রত্যয়ে শাম্মাস সেদিন রাসূলকে (সা) সুস্থ, অক্ষত এবং সুরক্ষিত রাখার সুদৃঢ় অঙ্গীকারে স্থির ছিলেন।

শত্রুর মুকাবেলায় তিনি নিজেকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

তার দুঃসাহসিকতায় মুগ্ধ হলেন রাসূল (সা)।

সেই সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তের কথা স্মরণ করে রাসূল (সা) নিজেই বলতেন :

'একমাত্র ঢাল ছাড়া আমি শাম্মাসের আর কোনো উপমা পাই না।'

সত্যিই তাই।

সেদিন রাসূল (সা) যেদিকেই দৃষ্টি দেন, কেবল শাম্মাসকেই দেখতে পান।

শাম্মাস সেদিন প্রকৃত অর্থেই রাসূলের (সা) ঢালে পরিণত হয়েছিলেন।

ঢাল তো নয়, যেন দুর্ভেদ্য পর্বত।

কিন্তু এর জন্য শাম্মাসের দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল কাফেরদের আঘাতে।

যুদ্ধ শেষ।

অক্ষত আছেন রাসূল (সা)।

www.icsbook.info

আর তাঁকে অক্ষত রাখতে শাম্মাস যে জীবন বাজি রেখেছিলেন, তাতে করে শাম্মাস শত্রুদের আঘাতে জর্জরিত হয়ে গেছেন।

অচেতন শাম্মাস।

সেই অবস্থায় তাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে তুলে আনা হলো মদীনায়।

তখনো তিনি বেঁচে আছেন।

বেঁচে আছেন, কিন্তু মুমূর্ষু অবস্থা।

এভাবে আর কতক্ষণ?

অবশেষে তিনি একদিন পরই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পাড়ি জমালেন আল্লাহর দরবারে।

শহীদ হলেন হযরত শাম্মাস!

কিন্তু তার সেই দুঃসাহস আর সোনালি সূর্যকিরণ কি এখনও প্রতিটি মুমিনের হৃদয়ে কম্পন তোলে না?

তোলে বৈকি! সে এক সাহসে ভরা অবাক শিহরণ!

কারণ শহীদ হওয়া ছাড়া একজন মুমিনের চূড়ান্ত কামনা আর কিইবা থাকতে পারে?

আর এক্ষেত্রে শহীদ শাম্মাসের মত দুঃসাহসী নিবেদিত ও আলোকিত প্রাণই তো আমাদের জন্য সকল সময় প্রেরণার উৎস।■

www.icsbook.info